সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২১

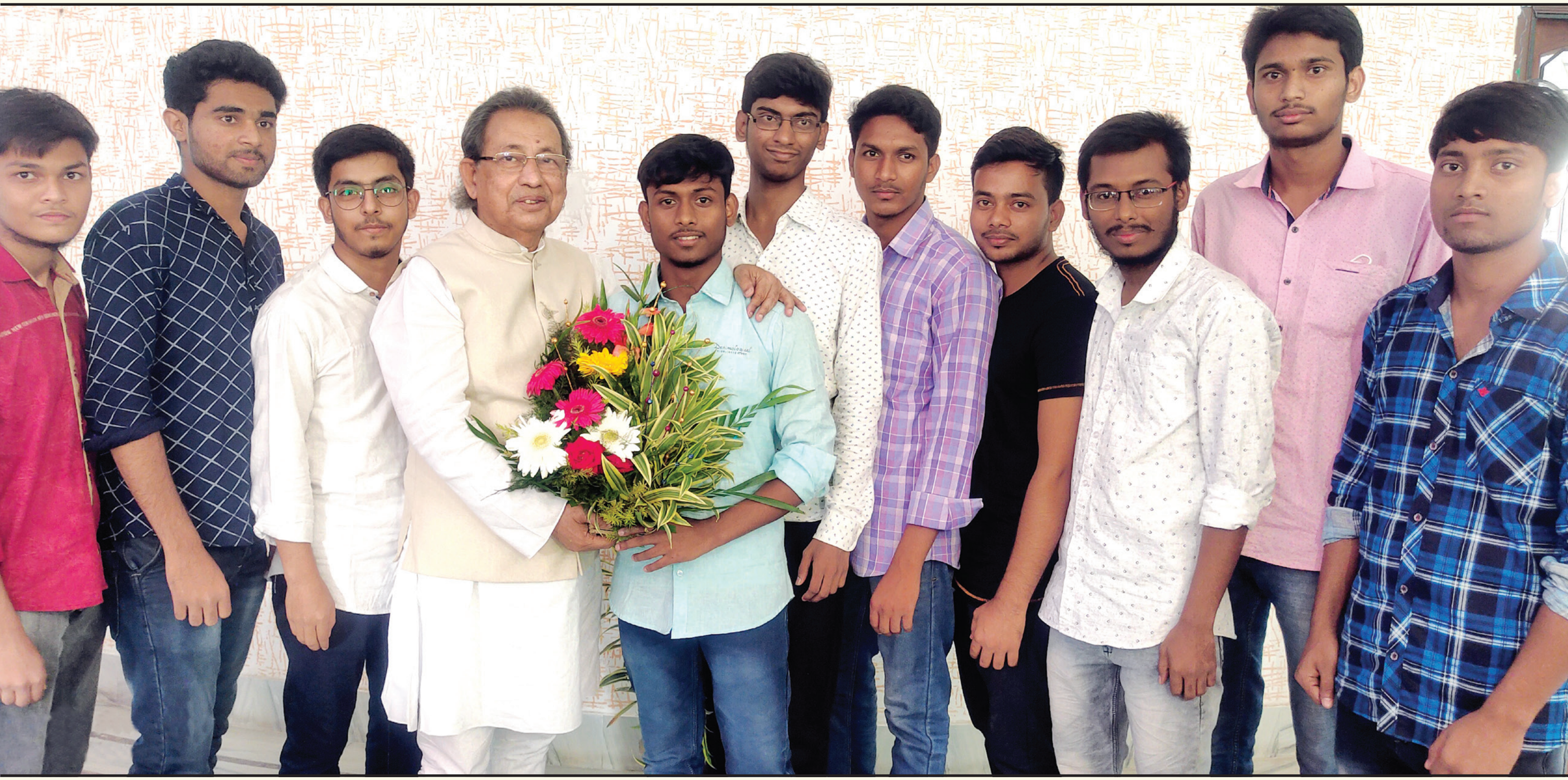

আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২১

সর্বভারতীয় আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কোর্সে ভর্তির পরীক্ষায় এ-বারও আল-আমীন মিশনের জয়জয়কার।
পাঁচ শতাধিক সফল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথমদিকের সাতচল্লিশ জনের সংগ্রাম ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে
এই পুস্তিকাটি মিশনে পাঠরত বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে রচিত।

সম্পাদনা

শেখ হাফিজুর রহমান

লেখা

আসাদুল ইসলাম   একরামুল হক শেখ

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিয়া ১, নিউটাউন
কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org, ই-মেল: alameenmission@yahoo.com।

প্রাক্কথন

প্রতিবছর সর্বভারতীয় আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কোর্সে ভর্তির পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলেই আল-আমীন মিশনের অন্তর থেকে উঠে আসে নীরব জয়ধ্বনি। পড়ুয়াদের ধারাবাহিক সাফল্য চমৎকৃত করে। তবু বলতে হয়, ২০২১ সালের মেডিকেল এন্ট্রান্স পরীক্ষা (NEET)-য় মিশনের শিক্ষার্থীদের সাফল্য যেন ছিল চোখধাঁধানো। কেন? এ-বার ৫৩০ বা ততোধিক নম্বরপ্রাপ্তদের মধ্যে আল-আমীনের পড়ুয়াসংখ্যা ৫১৮ জন। এদের মধ্যে ১২৬ জন সফলতাকে ছুঁতে পেরেছে আমাদের জাকাত ফান্ড স্কলারশিপ পেয়ে।

তবু অনেকের কৌতূহল— প্রতিবছর এমন রেজাল্ট কী করে হয়?

সবাই জানেন, আল-আমীনের অধিকাংশ পড়ুয়া আসে গ্রামীণ বাংলা থেকে। এরা সবাই বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়া। এরাই সরাসরি ইংরেজি মাধ্যমে NEET পরীক্ষা দিয়ে বঙ্গবাসীকে, তথা ভারতবাসীকে, তাক লাগিয়ে দেয়।

অথচ শিক্ষার সঙ্গে এদের অনেকেরই পরিবারের সম্পর্ক সবেমাত্র, এই প্রজন্মের মাধ্যমে। এবং এই নির্মম তথ্যটুকুও অধিকাংশ জন জানেন, এইসব পড়ুয়ার বড়ো একটা সংখ্যা আসে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সমাজের একেবারে পিছিয়ে পড়া অংশ থেকে। কোন জাদুতে এরা দিগন্ত ছুঁতে পারছে?

আল-আমীন মিশন শুরুর থেকে এই সারকথাটিকে আশ্রয় করেছে যে, শিক্ষাই ভাঙতে পারে এই অচলায়তন। আনতে পারে সামাজিক পরিবর্তন। তাই, বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আল-আমীন মিশন শিক্ষার মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-সাধনায় আমর্ম নিয়োজিত। মিশন এই কাজটি আন্তরিকভাবে করে আসছে শিক্ষানুরাগী আর দরদি মানুষের দানে এবং জাকাতের অর্থে।

আর, সাফল্য? মিশনের এই উদ্‌যোগে রাজ্যজুড়ে এসেছে বিরাট এক পরিবর্তন। যে-চিকিৎসকসমাজে বিরল ছিল এদের উপস্থিতি, আজ সেই সমাজে এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

এসেছে আরও এক সদর্থক পরিবর্তন। যেসব পড়ুয়া একদিন জাকাতের অর্থে বিদ্যার্জন করেছে, জীবনে সফল হয়ে তারাই আজ হয়ে উঠছে পিছিয়ে পড়া সমাজের শিশু-কিশোরদের শিক্ষার জন্য জাকাতপ্রদানকারী এবং দেশের আয়করদাতা। এবং এদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

এই উপলক্ষ্যে মিশনের সকল শুভানুধ্যায়ী ও দাতাদের জানাই হার্দিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

এম নুরুল ইসলাম

২৩ এপ্রিল ২০২২

সাধারণ সম্পাদক, আল-আমীন মিশন

সূ চি প ত্র

তৌহিদ মুর্শিদ	৫
মোকসেদুল মোল্লা	৫
মহম্মদ সৈয়ব আখতার	৬
কাসীদ আখতার	৭
দেবস্মিতা দাঁ	৮
জহির উদ্দিন বিশ্বাস	৮
সেখ আসাদুল	৯
সেখ আল আমীন	১০
উম্মে হানি	১১
মহম্মদ আশিফ কামাল গাজী	১৩
নসিব আহমেদ	১৪
মহম্মদ আবদুল্লাহ্	১৪
সোনিয়া দুবে	১৬
আব্দুল আজিজ	১৭
রমজান আলি খান	১৭
সামিরুদ্দিন সেখ	১৯
সাহানাজ খাতুন	২০
সাহীন আলম	২০
মিজানুল ইসলাম	২১
নূর হাসান গাজী	২২
সাহিদ আহমেদ	২৪
ওয়াহিদা রহমান	২৪
আব্দুল হামিদ সেখ	২৫
সেখ কবীর মহিউদ্দিন	২৭
হেদায়েত নুর আলি	২৮
আয়াতুল্লা হাবিবি	২৯
অভীক রোশন	৩০
আরমান মোল্লা	৩০
আবু আল সোহেল রানা	৩১
সোয়েব আখতার খান	৩২
সেক নাদিম আলি	৩৩
মির্জা আব্বাস	৩৪
রুবেল মোল্লা	৩৫
উজ্জ্বল সেখ	৩৬
রাজ মল্লিক	৩৭
রাজিবুল ইসলাম সর্দার	৩৮
নিশাত তাসনিম	৩৯
রূপা খাতুন	৪০
ইনামুল হাসান খান	৪১
আসিফ ইজাজ সরকার	৪২
ফারহিন সুলতানা	৪৩
সালেমা খাতুন	৪৪
সেখ রাজীব	৪৫
সেখ জুয়েল	৪৬
নাজমি খাতুন	৪৭
আতাউল শা	৪৮
মোফাস্সের মোল্লা	৪৯

তৌহিদ মুর্শিদ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৭২, প্রাপ্ত নম্বর ৬৯০

বর্ধমান মহাবীর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড সফদরজং হসপিটাল

ডাক্তারি পড়ার ভর্তির পরীক্ষা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি-কাম-এন্ট্রান্স টেস্ট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট বা নিট (ইউজি) পরীক্ষায় ২০২১ সালে আল-আমীন মিশনের পড়ুয়াদের মধ্যে প্রথম হয়েছে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর গ্রামের ছেলে তৌহিদ মুর্শিদ।

আল-আমীন মিশনের যে-শাখা থেকে ২০০৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছিল, সেই দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুর শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পড়াশোনা করেছে তৌহিদ। ২০১৮ সালে মাধ্যমিকে সে ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করার পর আল-আমীন মিশনের হাওড়ার উলুবেড়িয়া শাখায় চলে আসে। ওখানে দু-বছর পড়াশোনা করার পর ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পায়। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ২০২০ সালে নিট পরীক্ষাও দিয়েছিল তৌহিদ। তার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৬১১০৭। এরপর আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় এক বছর নিটের কোচিং নেয়। ২০২১ সালের নিটে সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৪৭২। ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬৯০ নম্বর। দেশের সেরা মেধাবী প্রায় ১৬ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম ৫০০ জনের তালিকায় নাম তুলতে সফল হয়েছে আল-আমীন মিশনের মেধাবী পড়ুয়া তৌহিদ মুর্শিদ। সে দিল্লির বর্ধমান মহাবীর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড সফদরজং হসপিটালে এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েছে।

তৌহিদ এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তার স্নাতক পিতা মোহাম্মদ নরুল হক হাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মা ইসমোতারা খাতুন মাধ্যমিক পাস। তিনি একজন স্বাস্থ্যকর্মী। তৌহিদেরা দু-ভাই এক বোন। দাদা ফুরকান হাবিব আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। আল-আমীনের হাত ধরে ফুরকান এখন ইঞ্জিনিয়ার। তৌহিদের বোন মেরী কুলসুম আল-আমীন মিশনে একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ পরিবারের তিন সন্তানকেই সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বাবা-মা ভরসা রেখেছেন আল-আমীন মিশনের ওপর। একজন ইতোমধ্যে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, একজন ডাক্তার হওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল এ-বছর। কন্যাসন্তানটিও যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি করতে সক্ষম হবে, তা তার দাদাদের সাফল্য থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

মোকসেদুল মোল্লা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৬২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আল-আমীন মিশনের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সর্বভারতীয় স্তরে ৬৬২ র‍্যাঙ্ক করেছে মোকসেদুল মোল্লা। তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৮৫। মোকসেদুলের বাড়ি হাওড়া জেলার রাজাপুর থানার তেহট্ট গ্রামে। মোকসেদুলের পিতা মুজিবর মোল্লার পড়াশোনা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। পেশায় তিনি জরির কারিগর। মোকসেদুলের মায়ের নাম জ্যোৎস্না বেগম। মাধ্যমিক-পাস মা গৃহবধূ। মোকসেদুলরা দু-ভাই এক বোন। দাদা মোহিবুল্লাহ্ মোল্লা স্নাতক হওয়ার পর গ্রামীণ চিকিৎসক হিসেবে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকেন। তার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে।

ভাইকে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিধারী চিকিৎসক করার লক্ষ্যে দাদা মোহিবুল্লাহ্‌র উৎসাহে মোকসেদুলকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করা হয়।

মোকসেদুল ২০১৯ সালে মাধ্যমিকে ৮৩.৪ শতাংশ নম্বর পাওয়ার পর আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখায় সে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পড়াশোনার সঙ্গে নিট কোচিং নিয়েছিল। ২০২১ সালে মোকসেদুল উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৮৭.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। একটা বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা হল, রানিং ইয়ারে, অর্থাৎ উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরেই নিট পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া।

অনেক ছেলে-মেয়েই রানিং ইয়ারে নিট র‍্যাঙ্ক করা দুরূহ বিষয় বলে মনে করে। কিন্তু সেটা যে অসম্ভব কিছু না, তা মোকসেদুলের ফল দেখিয়ে দিয়েছে। কী করে এমনটা হল? মোকসেদুল তার নিট প্রস্তুতির বিষয়ে বলতে গিয়ে জানিয়েছে, "একাদশ শ্রেণি থেকেই এনসিইআরটি এবং অবজেকটিভ বই পড়েছি।" লক্ষ্যভেদী প্রস্তুতিই হয়তো তাকে ভালো ফল করতে সাহায্য করেছে।

মহম্মদ সৈয়ব আখতার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১২৬২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

এবার আসি মহম্মদ সৈয়ব আখতারের কথায়। সৈয়ব র‍্যাঙ্ক করেছে ১২৬২। ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬৭৫। সৈয়বের বাড়ি মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে। পিতা মহম্মদ মখলুকাত আলি উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে তিনি শ্রমিকের কাজ করতে চলে যান বিভিন্ন রাজ্যে। সৈয়বের মা আমেনা বিবির পড়াশোনা ক্লাস সিক্স পর্যন্ত, তিনি সংসার সামলান। একমাত্র বোন গ্রামের স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে।

সৈয়ব মাধ্যমিকে ৮৯.১৪ শতাংশ এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছিল। এরপর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য সে আল-আমীন মিশনে নিট-এর কোচিং নিতে আসে। আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখায় সে পড়ার সুযোগ পায়। পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভালো না হওয়ায় আল-আমীন মিশন অনেকটাই আর্থিক ছাড় দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ দেয়। মাত্র এক তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে সে পড়েছে আল-আমীন মিশনে। শুধু তা-ই নয়, কোভিডের ফলে লকডাউন শুরু হওয়ার কারণে বাড়তি ছাড়ও সে পেয়েছে, ফলে তার মতো দরিদ্র পরিবারের ছেলের পড়াশোনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে সৈয়ব। তার পরীক্ষার ভালো ফল, আর্থিক ছাড় পাওয়া এবং তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সে খলিশানি শাখার সুপারিনটেনডেন্ট আনিসুর রহমানের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

সৈয়বের কথায়— "আমি আগে ভেবেছিলাম ডাক্তার নয়, শিক্ষক হব। কিন্তু বর্তমানে চাকরিবাকরির অবস্থা শোচনীয়

দেখে সিদ্ধান্ত বদলাই। বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাই ডাক্তার হলে দ্রুত আর্থিক সুরাহা হতে পারে ভেবে সিদ্ধান্ত বদলাই।” অন্য প্রতিষ্ঠানেও সৈয়ব পড়েছে, আল-আমীনে বাড়তি সুবিধা কী আছে জানতে চাওয়া হলে সে জানায়, “প্রথমত, পড়াশোনার পরিবেশ খুব ভালো। দ্বিতীয়ত, যে-বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এখানে বন্ধুদের মধ্যে বিরাট কম্পিটিশন আছে। অর্থাৎ অনেক ভালো ছেলে-মেয়েকে কম্পিটিটর হিসেবে পাওয়া যায়। অন্য প্রতিষ্ঠানে সেটা কম। প্রতিযোগিতা চলে বলে অনেকের মধ্যে ভালো ফল করার ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।”

কাসীদ আখতার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৩১০, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

২০২১ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের সফল পড়ুয়াদের মধ্যে চতুর্থ হয়েছে কাসীদ আখতার। হাওড়া জেলার ডোমজুড় থানার দক্ষিণ নয়াবাজ গ্রামে বাড়ি কাসীদের। সাঁতরাগাছির কাছে নয়াবাজে আল-আমীনের যে-শাখা আছে, তার পাশেই বাড়ি।

বাবা-মা আর এক বোন— মোট চার জনের পরিবার। কাসীদের পিতা শামীম আখতার বিজ্ঞানে সাম্মানিক স্নাতক। মা রেহেনা সুলতানাও স্নাতক। শামীম সাহেব বাড়ি, অফিস চত্বরের বাগান সাজিয়ে দেওয়ার চুক্তিভিত্তিক ব্যাবসা করেন। কাসীদের বোন সেরিব্রাল পালসি রোগে আক্রান্ত। ২০১৮ সালে কাসীদের মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় বোনের অসুখ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়। পড়াশোনায় ক্ষতি হয়। কাসীদ মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করার পর ভালো পরিবেশে আবাসিক রেখে ছেলেকে পড়ানোর

সিদ্ধান্ত নেন তার বাবা-মা। তাঁরা আল-আমীন মিশনকে সঠিক জায়গা ভেবে ছেলেকে ভর্তির পরীক্ষায় বসান। ভর্তির পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কাসীদ আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়।

২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে রাজ্যস্তরে নবম স্থান অধিকার করে। প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৮.২ শতাংশ। রানিং ইয়ারে নিট র‍্যাঙ্ক হয় ৬৮৫৭৭। জেইই মেইন পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ারও সুযোগ পায়। কিন্তু ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে আরও এক বছর নিট কোচিং নেয় আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায়। এক বছর বাড়তি সময় ব্যয় করার ফল হল, ২০২১ সালের সর্বভারতীয় নিটে চমকপ্রদ র‍্যাঙ্ক। কাসীদ দেশের প্রায় ১৬ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৩১০ র‍্যাঙ্ক করেছে।

মেধাবী কাসীদ বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে মাধ্যমিকে যে-ফল করেছিল, আল-আমীন মিশনে আবাসিক হিসেবে থেকে পড়াশোনা করে মাধ্যমিকের থেকে কয়েক গুণ বেশি কঠিন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় আরও ভালো ফল করেছে। আবার উচ্চ-মাধ্যমিকের থেকে অনেকটাই কঠিন নিট পরীক্ষায় পাস করা। অনেকে উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো ফল করলেও নিটে ভালো র‍্যাঙ্ক করতে পারে না। কিন্তু কাসীদ অত্যন্ত ভালো র‍্যাঙ্ক করতে সমর্থ হয়েছে। এর কারণ হিসেবে কাসীদ জানায়, আল-আমীন মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, স্যারদের সর্বক্ষণের সাহায্য, বন্ধুদের সঙ্গে গ্রুপ ডিসকাশন।

আল-আমীন মিশনে না এলে তার এমন ফল হত কি না, সে-বিষয়ে

সন্দিগ্ধ সে। কাসীদ নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়ায় তাকে অর্ধেকের অনেক কম বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে আল-আমীন মিশন। বই পড়তে এবং ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে কাসীদ। প্রিয় বোনের অসুস্থতা দেখে কাসীদ নিউরো সার্জন হওয়ার স্বপ্ন দেখে। নিজের বোন যে-কষ্টে আছে, সেই কষ্টে ভোগা মানুষদের কষ্ট লাঘব করার ইচ্ছে নিয়েই ডাক্তারিতে আসা। কাসীদের সেই স্বপ্নপূরণে আল-আমীন মিশন উদার সহায়তা নিয়ে পাশে থেকেছে।

দেবস্মিতা দাঁ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৭৮৬, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আল-আমীন মিশন মূলত সংখ্যালঘু মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অমুসলমান পড়ুয়ারাও কোচিং নিতে পারে আল-আমীন মিশন স্টাডি সার্কলে, এটি অবস্থিত কলকাতার পার্কসার্কাসে। এ-বছর নিটে সফলদের তালিকায় মিশনের মধ্যে পাঁচ নম্বরে নাম আছে দেবস্মিতা দাঁর। দেবস্মিতা কলকাতার বরানগর থানার সিঁথির মোড় এলাকার মেয়ে। বাবা দিব্যেন্দু দাঁ বি.এ. পাস, ব্যাবসা করেন। মা ফাল্গুনী দাঁও বি.এ. পাস, গৃহবধূ। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান দেবস্মিতা।

দেবস্মিতা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে। ছোটো থেকেই পড়াশোনায় ভালো। ফাইভ থেকে টেন পর্যন্ত পড়েছে বাগবাজারের রামকৃষ্ণ সারদা সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে। এটা রামকৃষ্ণ মিশনেরই একটা ডে-স্কুল। ২০১৯ সালে কোভিড শুরু হওয়ার আগের বছর, দেবস্মিতা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৯৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করেছিল। উচ্চ-মাধ্যমিকটা সে পড়েছে দি পার্ক ইনসটিটিউশনে। এটা শ্যামবাজার এলাকার একটা বাংলা মাধ্যম স্কুল। ২০২১ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছিল ৯৭.৪ শতাংশ নম্বর।

এ-বছরই রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় বসে তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ১৭৮৬। নিজের প্রস্তুতিকে পরখ করার জন্য আল-আমীন মিশনে আসে আল-আমীনের মকটেস্ট, ক্লাসটেস্টগুলো দেওয়ার জন্য। কোভিডের কারণে পরীক্ষাগুলো অনলাইনেই দিয়েছিল। মকটেস্ট, ক্লাসটেস্ট দেওয়ার জন্য একটা ফি আছে, যেমন থাকে সব ইনসটিটিউটের। কিন্তু আল-আমীন মিশন থেকে জানানো হয়েছিল— যেমন পারবেন দেবেন। এমন প্রস্তাব ভালো লেগেছিল দেবস্মিতাদের। মেধাবী দেবস্মিতার নজরকাড়া সাফল্যে আল-আমীন পরিবারও ভূমিকা রাখতে পেরে খুশি।

জহির উদ্দিন বিশ্বাস

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৯৪৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩১

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাশীপুর থানার শ্যামনগর গ্রামের জহির উদ্দিন বিশ্বাসকে তার প্রায় পড়ালেখা-না-জানা পিতা নজরুল বিশ্বাস পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষ করার স্বপ্ন দেখতেন বহু দিন থেকেই। সেই লক্ষ্যেই ছোট্ট জহিরকে হস্টেলে রেখে পড়াতে

চেয়েছেন। সফলও হয়েছেন। পিতার লালিত স্বপ্নকে পূরণ করেছে জহির।

জহির ২০২১ সালের নিটে সর্বভারতীয় স্তরে ১৯৪৮ র‍্যাঙ্ক করেছে। আল-আমীন মিশনে এসেছিল মাধ্যমিক দেওয়ার পর। মাধ্যমিকে সে পেয়েছিল ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর। আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় দু-বছর পড়ার পর উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর হয় ৯৬.২ শতাংশ। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার পাশাপাশি নিট পরীক্ষাও দিয়েছিল। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৪৭৮১৮। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েও তা গ্রহণ করেনি জহির। এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে সে খলতপুরেই আবার নিটের কোচিং নিতে শুরু করে। কিন্তু কোভিডের কারণে কোচিং ভালো করে নেওয়া হয়নি। তবু নিট পরীক্ষায় তার সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ১৯৪৮।

এটা কীভাবে সম্ভব হল? জহির জানায়, "আসলে ইলেভেন-টুয়েলভের পড়াটাই অনেকটা কাজ দেয় নিটের জন্য, যদি ঠিকঠাক পড়া যায়। আমাদের মিশনে যেমন রাজ্যের সিলেবাসের পাশাপাশি ইলেভেন-টুয়েলভ থেকেই এনসিইআরটির বই পড়ানো হয়েছিল, সেটা কাজে লেগেছে খুব।" প্রাথমিকের গণ্ডি পার করা পিতা আর মাধ্যমিক-পাস মায়ের সন্তান জহির এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হয়ে পুরো পরিবারকেই যে বদলে দেবে, তা না বললেও চলে। তবে এটুকু বলার, জহির যে ডাক্তার হতে চলেছে, তার পেছনে আছে তার বাবা-মায়ের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ। গ্রামে মুদিখানা চালানো পিতার বড়ো স্বপ্ন দেখার সাহসই এই জহিরকে পৌঁছে দিয়েছে ডাক্তার হওয়ার দোড়গোড়ায়। প্রায় পূর্ণবেতন দিয়েই ছেলেকে মিশনে পড়ানোর সংকল্প থেকে পিছু হঠেননি তিনি।

সেখ আসাদুল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২১১৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আব্বা ক্লাস এইট-পাস। পেশা চাষবাস। মা পড়েছেন ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। গ্রামের দিকে এমন গৃহবধূদের পেশাদারি কাজ করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এই মাও সংসারের কাজকর্মই করেন। তিন দিদির মধ্যে এক জনের বিয়ে হয়ে গেছে। দু-জন বিবাহযোগ্যা। ছোটোবোন সরকারি স্কুলে উচ্চ-মাধ্যমিকে পড়ে। মাটির বাড়ি, টিনের ছাউনি দেওয়া। লকডাইনে সবাই যখন ঘরবন্দি, তখন নিভৃতে যে নিট পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা করবে এমন আলাদা কোনো ঘর পায়নি ছেলেটি। তবু সেই ছেলে নিট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করেছে ২১১৫। ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬৬৫ নম্বর।

এই গল্পটা বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার দৌলতচক গ্রামের সেখ আসাদুলের। আসাদুলের পিতার নাম সেখ আব্দুল রাজ্জাক। মায়ের নাম সায়েমা বিবি। ২০১৭ সালে আসাদুল ৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করার পর, তার বাবা যখন একাদশ শ্রেণিতে এক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেন, তখন ছেলেকে ডাক্তার করার কথা তিনি তেমনভাবে ভাবেননি। ছেলে ভালো পড়াশোনা করবে সেই আশায় ভর্তি করা। ২০১৯ সালে ৮৯.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর ডাক্তার করার স্বপ্ন নিয়ে আল-আমীন মিশনে আসাদুলকে ভর্তি করা হয়। আল-আমীনের উলুবেড়িয়া শাখায় ভর্তি হওয়ার পর আসাদুল এনসিইআরটির বইয়ের কথা শোনে। নিট পরীক্ষায় সফল হতে গেলে এনসিইআরটির বই পড়া

জরুরি বলে আল-আমীন মিশন ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস ইলেভেন থেকেই এনসিইআরটির বই পড়াতে অভ্যস্ত করে তোলে। উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরে আসাদুল নিট পরীক্ষাই দেয়নি।

আল-আমীনে আসার পর আসাদুলের চেতনা ফিরতে শুরু করে। মিশনের উলুবেড়িয়া শাখার শান্ত এবং পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ, স্যারদের আন্তরিকতা এবং বিষয়গুলো রপ্ত করার টেকনিক দ্রুত আত্মস্থ করতে শুরু করে। অনেকটা পিছিয়ে থেকে শুরু করায় তীরে গিয়েও তরী ডুবে যায়। ২০২০ সালের নিট পরীক্ষায় সে পায় ৫৩২ নম্বর। হোমিয়োপ্যাথি, আয়ুর্বেদিক, ইউনানি ডাক্তার হওয়ার সুযোগ পেলেও, তা না নিয়ে আরও এক বছর প্রস্তুতির পিছনে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। লকডাউন পরিস্থিতি এলোমেলো করে দিলেও লক্ষ্য স্থির রেখে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় বসে ২০২১ সালে। র‍্যাঙ্ক হয় ২১১৫। আল-আমীন মিশনের নিট পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সপ্তম হয়েছে আসাদুল।

কৃষক পরিবারের এই সন্তানের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নপূরণে পাশে দাঁড়িয়েছে আল-আমীন মিশন। অর্ধেকেরও কম বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে আসাদুল। কথাপ্রসঙ্গে আসাদুল জানায়, বোনদের বিয়ের কথা। হয়তো জমি বিক্রি করেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে এই আর্থিক অনটন আর কয়েক বছর, তারপর তাদের গোটা পরিবার ঘুরে দাঁড়াবে তার হাত ধরে, যে-হাতটা ধরে আল-আমীন মিশন তাকে এগিয়ে দিয়েছে সাফল্যের দিকে।

সেখ আল আমীন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৪৪০, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৪৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম আর পড়ুয়ার নাম এক, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না। নিট পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের সফল পড়ুয়াদের তালিকায় নাম আছে সেখ আল আমীনের। আল-আমীন মিশনের পড়ুয়া সেখ আল আমীন এ-বছর, অর্থাৎ ২০২১ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করেছে। সে সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে ২৪৪০। সফলদের তালিকায় তার নাম আছে আট নম্বরে।

ডাক্তার হতে চলা এই পড়ুয়া কেমন পরিবারের সন্তান একটা নমুনাতেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আল আমীনকে নিয়ে লেখার জন্য তথ্য নিতে ফোন করা হলে তার আব্বা প্রথমে ফোনটা ধরেন। কে ফোন করেছি, সেটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানান, “আমি তো কিছুই জানি না, বুঝব না কিছুই। ছেলের সঙ্গে কথা বলুন” বলে ফোন যে-দ্রুততার সঙ্গে দিয়ে দিলেন, তাতে মনে হল, তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোনোরকমে নামসই-করতে-পারা সেখ মইদুল আলির কাছ থেকে তো এমন কথা শোনাই স্বাভাবিক। জরির কাজের কারিগর মইদুল আলির স্ত্রী হালিমা বেগমের পড়াশোনাও প্রাথমিকের গণ্ডির ভেতরেই। প্রায়-পড়াশোনা-না-জানা বাবা-মায়ের সন্তান সেখ আল আমীন তবু ডাক্তার হওয়ার মতো গৌরবের জায়গায় পৌঁছোল কীভাবে? কারণ, সে পেয়েছে কাজী সামসুজ্জোহার মতো দ্বিতীয় অভিভাবককে। কাজী সামসুজ্জোহা অঙ্কের শিক্ষক। শিক্ষকতা করেন আল-আমীন মিশনে। সেখ আল আমীনের প্রতিবেশী হওয়ায় তিনি বুঝেছিলেন, আল আমীন ভবিষ্যতের তারকা। সেখ আল আমীন

যখন নীচু ক্লাসের ছাত্র তখন আল-আমীন মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আল-আমীনের ভর্তির পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি সেখ আল আমীন। তার স্যার বিকল্প হিসেবে অন্য আবাসিক মিশনে ভর্তির বিষয়ে সচেষ্ট হন। সেই মিশনে থেকে অনেকটাই তৈরি হয়ে যায়। ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে সে ৯০ শতাংশের কিছু বেশি নম্বর পেয়ে পাস করে। সামসুজ্জোহা সাহেব আবার আল-আমীন মিশনে নিয়ে আসেন। সেখ আল আমীনকে এ-বার আশ্রয় দেয় আল-আমীন। আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখায় পড়ার সুযোগ পায়। ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৮৭.৫ শতাংশ নম্বর পায়। এরপর ওই ব্রাঞ্চেই নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এক বছর আবাসিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ২০২০ সালে তার র‍্যাঙ্ক হয় ৬৬৯০৯। এই র‍্যাঙ্কে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ মিলল না। তাই আরও এক বছর প্রস্তুতি নিল আল-আমীন মিশনের খলিশানি শাখাতেই। ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় সেখ আল আমীনের লড়াই সফল হল, ২৪৪০ র‍্যাঙ্ক হল সর্বভারতীয় স্তরে।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার বানিবন জগদীশপুর গ্রামে আল আমীনের বয়সি ছেলেরা গুটখা মুখে দিয়ে চুল রাঙিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়। সেই এলাকায় বেড়ে ওঠা আল আমীন এলাকার গর্ব হয়ে উঠেছে। জরির কাজ এক সময় ভালো চলত, তখন আল আমীনের আব্বা মইদুল সাহেব ইটের গাঁথনি দিয়ে দু-কামরা ঘর বানিয়েছিলেন। কিন্তু আজও সে-ঘরে চুনের ছোঁয়া লাগেনি। আল আমীনের এক বোন আছে, সে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। আল আমীনের আশা আর মাত্র কয়েক বছর, তারপর সব বদলে যাবে। ভালো বাড়ি হবে, ভালো পাত্র দেখে বোনের বিয়ে দেবে এই স্বপ্ন দেখে আল আমীন। আব্বাকে সপ্তায় সপ্তায় কাজ চেয়ে হত্যে দিতে হবে না ওস্তাগারের কাছে। ফোনের ওপার থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ইনশাআল্লাহ্ শব্দ শোনা যায় স্পষ্ট, জড়তাহীন।

আল-আমীন মিশন, সেখ আল আমীনকে চার বছর এক তৃতীয়াংশ বেতনে পড়ার সুযোগ শুধু দেয়নি, সামসুজ্জোহা সাহেব যে-সম্ভাবনা দেখেছিলেন প্রিয় ছাত্রের মাঝে, সেই সম্ভাবনাকে অনুকূল পরিবেশ দিয়ে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। আল আমীনের সাফল্য তার পরিবারকে তো বদলে দেবেই, অদূর-ভবিষ্যতে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও পড়ালেখার প্রতি ইতিবাচক মন তৈরিতে সাহায্য করবে। সবচেয়ে বড়ো পাওয়া হবে সেটিই।

উম্মে হানি

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৬৭৪, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৫৩

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

নামটা দেখে মনে হল কোনো মেয়ের নাম। আল-আমীন মিশনের নিট সফলদের ছবি দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখলাম ছেলের ছবি। ভুল ছবি ছাপেনি তো? প্রদত্ত ফোন নম্বরে ফোন করলাম। উম্মে হানির পিতা ফোন তুললেন। নাম-বৃত্তান্ত তিনি শোনালেন। আল-আমীন মিশনের ২০২১ সালের নিট পরীক্ষার সাফল ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় নবম স্থানে আছে উম্মে হানি।

তার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নামে হোঁচট খাওয়া প্রথমে। হানির পিতা আব্দুর টিঙ্কু বিশ্বাস আসলে একজন মৌপালক।

মধু-উৎপাদনকারী। সদ্যোজাত পুত্রের সঙ্গে 'হানি' নাম জুড়ে দিয়েছিলেন হাসপাতালের মানুষজন। আর সেই ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময় থেকে মধু-উৎপাদনের সঙ্গে জুড়ে থাকা পিতা মনে করেছিলেন মধুই আমাদের বাঁচা-মরা, মধুই আমাদের সব— মায়ের মতো। সেই ভাবনা থেকে উম্মে হানি।

উম্মে হানির পিতাকে যখন ফোনে ধরলাম, তখনও তিনি আছেন মৌপালনের জায়গায়— উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে। মালদা জেলার কালিয়াচক থানার গাজিপুর কবিরাজতলা গ্রামের মানুষ। উম্মে হানির চেয়ে তার পিতার লড়াই অনেক বেশি। অল্পবয়সে পিতাকে হারিয়েছিলেন— প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় রেখে পিতা বিদায় নিয়েছিলেন। তাই রোজগারের দিকে ঢুকতে হয়েছিল খুব কম বয়সেই। মৌপালনের প্রশিক্ষণ নিয়ে, নিজের পড়াশোনার খরচ আর পরিবারের আর্থিক সহায়তা করা— দুই কাজ একসঙ্গে চালিয়েছেন মধু উৎপাদনের কাজ করে। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে কলেজে ভর্তি হলেও আর পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়া স্ত্রী সাকিলা বানু আইসিডিএস-কর্মী। এক কন্যা দুই পুত্রকে নিয়ে মোট পাঁচ জনের সংসার।

তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে সবার বড়ো। তার নাম আসিফা বিশ্বাস। সে আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। বর্তমানে হাওড়ার মহেশ ভট্টাচার্য হোমিয়োপ্যাথি মেডিকেল কলেজে বি.এইচ.এম.এস. পড়ছে। ছোটোছেলে মোথাবাড়িতে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। ফার্স্ট হয়। আর উম্মে হানির পড়াশোনার রেকর্ড অন্য দুই সন্তানের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। তার পিতা জানালেন, "একদম ছোটোবেলা থেকেই দু-তিন মাসের মধ্যে স্কুলের বইয়ের সব পড়া শেষ করে ফেলত। ফলে প্রচুর বাড়তি বই কিনে দিতে হত।" কেশব নাগের অঙ্কের বই-সহ আরও অনেক অঙ্ক বই কিনে দিতে হত। কারণ, ছেলে 'অঙ্কের পোকা'। অঙ্কের ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যের মধ্যে তৃতীয় হয়েছিল উম্মে হানি।

উম্মে হানি আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস সিক্সে। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে আল-আমীন মিশনের দক্ষিণ দিনাজপুরের বেলপুকুর শাখায়। ২০১৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৪ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেছিল। আল-আমীন মিশনের একাদশ শ্রেণির ভর্তির পরীক্ষায় তৃতীয় হয়ে হাওড়ার সাঁতরাগাছি ক্যাম্পাসে আসে। ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল কোভিডের কারণে অনেক হেরফের হয়ে গেছে অনেকেরই। মেধাবী উম্মে হানি ৮৭.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে চমকপ্রদ ফল উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার পাশাপাশি সে নিট পরীক্ষাতেও সফল হয়েছে, নিটের প্রস্তুতির জন্য বাড়তি সময় তাকে ব্যয় করতে হয়নি। অত্যন্ত মেধাবী না হলে রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় যে সফল হওয়া যায় না, তা অনেকেই জানেন। আল-আমীন মিশন থেকে প্রতি বছর অবশ্য বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে রানিং ইয়ারেই নিট পাস করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে উম্মে হানির ফারাক হল র‍্যাঙ্কের। নিট পরীক্ষায় হানির র‍্যাঙ্ক হয়েছে ২৬৭৪। মেধাবী হানি মাধ্যমিক পর্যন্ত অর্ধেকেরও কম বেতনে পড়েছে আল-আমীন মিশনে। উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ফিতে এক তৃতীয়াংশ ছাড় পেয়েছে।

সাফল্যের প্রশ্নে হানি জানায়— "প্রথম থেকেই ভালো করে পড়তে

হবে এবং কনটিনিউ পড়ে যেতে হবে।” হানি রাত জেগে পড়তে পারত না। তাই ভোর চারটে থেকে রাত ন-টা পর্যন্ত পড়াশোনার মধ্যেই ডুবে থাকত। হানির প্রিয় সাবজেক্ট ফিজিক্স, প্রিয় খেলা ক্রিকেট। এখনও তার কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নেই। শুধু তা-ই নয়, হানির বাবা জানালেন, হানি সবসময় পড়াশোনায় এগিয়ে থাকে। যেমন এম.বি.বি.এস.-এর কাউন্সেলিংয়ের আগেই এম.বি.বি.এস.-এর পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে কার্ডিয়োলজির স্পেশালিস্ট হতে চায় হানি, ডি.এম. করতে চায়। এগিয়ে থাকে যারা, তারাই পথ দেখায়। হানির সাফল্য নিশ্চিত পথ দেখাবে অনেককে।

মহম্মদ আশিফ কামাল গাজী

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৮২০, প্রাপ্ত নম্বর ৬৫৯

অল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস, কল্যাণী

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হাসনাবাদ থানার ঘোষালআটি গ্রামে বাড়ি মহম্মদ আশিফ কামাল গাজীর। পিতার নাম সফি কামাল গাজী। মায়ের নাম তসলিমা কামাল গাজী। বি.এ.-পাস পিতা চাষবাস করেন, আছে মাছের চাষও। মা উচ্চ-মাধ্যমিক পাস, গৃহবধূ। আশিফের ছোটোভাই ক্লাস সেভেনে পড়ে, বাড়ির কাছে, সরকারি স্কুলে। আশিফ আল-আমীন মিশনের নিট পরীক্ষার সফল ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় আছে দশম স্থানে। তার র‍্যাঙ্ক ২৮২০।

আশিফ আল-আমীন মিশনে পড়ছে ক্লাস নাইন থেকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার হাসনেচা শাখা থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮৭.৭ শতাংশ নম্বর। এরপর উচ্চ-মাধ্যমিকে আল-আমীনের পাঁচুড় শাখায় ভর্তি হয়। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়ে পেয়েছিল ৯২ শতাংশ নম্বর। ওই বছর নিট পরীক্ষাও দিয়েছিল। পেয়েছিল ৫৪৬ নম্বর, র‍্যাঙ্ক ছিল পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। ডেন্টাল বা আয়ুষ ডাক্তার হওয়ার সুযোগ ছিল ওই র‍্যাঙ্কে। কিন্তু এম.বি.বি.এস. পড়ার লক্ষ্যে আরও এক বছর শুধু নিট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আল-আমীন মিশনেই। ২০২১ সালে নিট পরীক্ষায় তিন হাজারের মধ্যে র‍্যাঙ্ক এসেছে আশিফ কামাল গাজীর। সেই ক্লাস নাইন থেকে আশিফ আল-আমীন মিশনে প্রায় অর্ধেক বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চাষি-পরিবারের সন্তান ডাক্তার হতে চলেছে।

শুধু আশিফ নয়, ওদের পরিবারে আরেক জন ডাক্তারি পড়ছে। ওর চাচাতো দাদা সোহেল কামাল গাজী। সেও আল-আমীন মিশনে ক্লাস নাইন থেকে পড়ে নিট পরীক্ষায় ভালো র‍্যাঙ্ক করে বর্তমানে এসএসকেএম বা পিজি-তে ডাক্তারি পড়ছে। আশিফদের এলাকায় আশিফরা দুই ভাই ছাড়া আরও এক জন ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সেও আল-আমীন মিশনের ছাত্র। ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় সফল হয়েছে।

আশিফ নিটের প্রস্তুতি শুরু করেছিল ক্লাস টুয়েলভে পড়ার সময় থেকেই। উচ্চ-মাধ্যমিকের বাংলা মাধ্যমের বইয়ের পাশাপাশি এনসিইআরটির বইও পড়তে শুরু করেছিল। পড়াশোনার বাইরে ছবি আঁকতে ভালোবাসে আশিফ। ভবিষ্যতে সে সার্জারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে চায়।

নসিব আহমেদ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২৯০৯, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৫৬

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার পারদেওনাপুর গ্রামে নসিব আহমেদের বাড়ি হলেও তারা সপরিবারে বর্তমানে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ এলাকায়। তার মাধ্যমিক-পাস পিতা মহম্মদ হাবিবুর রহমান আকড়া এলাকায় হকারি করে কাপড় বিক্রি করেন। কাজের সূত্রেই গত প্রায় ছ-বছর ধরে আছেন বজবজে। হাবিবুর সাহেবের পুত্র নসিব পুরো পরিবারের নসিব বদলানোর বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে নিট পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করার মাধ্যমে। নসিব ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক করেছে ২৯০৯। আল-আমীন মিশনে ক্লাস সিক্স থেকে পড়েছে ধুলিয়ান শাখায়। ২০১৭ সালে ধুলিয়ান শাখা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৬৩২ নম্বর। শতকরা হিসেবে ৯০ শতাংশের একটু বেশি। এরপর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উস্থি শাখা থেকে ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮৮.৪ শতাংশ নম্বর। এরপর নিট কোচিং নেয় আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায়। ২০২০ সালের নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৩১৩৩। ২০২১ সালের নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য নয়াবাজ ক্যাম্পাস বাছে নসিব। ২০২১ সালে অবশ্য কোভিডের কারণে অল্প কিছুদিন ক্যাম্পাসে থাকার সুযোগ পেয়েছে। বাড়ি থেকে আল-আমীনের অনলাইনে ক্লাস, ইউটিউবে কিছু ক্লাস দেখা আর ২০২০ সালের পড়াকে সম্বল করেই তার চমকপ্রদ র‍্যাঙ্ক হয়েছে ২০২১ সালের পরীক্ষায়।

নসিব আহমেদের ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় মাসিক ফি ছিল মাত্র ৮৩০ টাকা। ক্লাস ফাইভ থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত তো বটেই, এমনকী নিট কোচিঙের প্রথম বছরেও নসিবের মাসিক বেতন ছিল মাত্র এক তৃতীয়াংশ। ২০২১ সালের কোচিং-ক্যাম্পাস বাছাতে জেদ করায় বেশি ফি নির্ধারিত হয়। যদিও লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় অনলাইন ক্লাস চালু হওয়াতে সেই বেতনও অর্ধেক করে দেওয়া হয়।

নসিবের বোন আফরিন নেসাও আল-আমীন মিশনের ছাত্রী। সে মিশনে পড়ছে ক্লাস ফাইভ থেকে। বর্তমানে বর্ধমান শাখায় টুয়েলভে পড়ছে। আফরিনকেও এক তৃতীয়াংশ ছাড় দিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে মিশন। নসিব তার সাফল্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছে— গ্রুপ-স্টাডি আর সেল্ফ-স্টাডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ক্লাস ইলেভেনে পড়ার সময় নসিব ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল, নিটের প্রস্তুতি নিতে সে তা একদিনও খুলে দেখেনি। নিট পরীক্ষায় সফল হতে গেলে অন্য কোনো দিকে খেয়াল দেওয়া চলবে না বলে জানিয়েছে নসিব।

মহম্মদ আবদুল্লাহ্

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩০৩৪, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৫৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আজকাল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৮ শতাংশ নম্বর পাওয়া তেমন বড়ো কোনো বিষয় নয়। মানে এমন নম্বর পাওয়া ছেলে-মেয়েদের অতি মেধাবী বলে মনে করার কিছু নেই। অনেকে মনে করেন,

ডাক্তার হতে গেলে ৮৫ বা ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পেতে হবে। মাধ্যমিকে ৭৮ শতাংশ আর উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়েও নিট পরীক্ষায় পাস করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। শুধু সুযোগ পাওয়া নয়, ৯০ বা ৯৫ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়েও চমকপ্রদ র‍্যাঙ্ক করা সম্ভব। অনেকে আবার মনে করেন ডাক্তারি পড়া আসলে উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য বরাদ্দ। যদি নিরক্ষর হন, সামান্য রাজমিস্ত্রির মজুর হিসেবে কোনোরকমে সংসারে সকলের খাবারটুকু কীভাবে জুটবে, সেই ভাবনায় ডুবে থাকেন, তবুও তাঁর সন্তান ডাক্তার হতে পারে। সেটা সম্ভব আল-আমীন মিশনের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান যদি পাশে এসে দাঁড়ায়। আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হয়, তেমন বহু অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে আল-আমীন মিশন। শত শত সেরকম উদাহরণের সঙ্গে এ-বছর ২০২১ সালে নিটে ৩০৩৪ র‍্যাঙ্ক করা মহম্মদ আবদুল্লাহ্‌র নামটাও যুক্ত হল।

আবদুল্লাহ্‌র বাড়ি মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার খোপাকাটি গ্রামে। পিতা মহম্মদ বাদিরুদ্দিন পড়াশোনা জানেন না। দিনমজুর হিসেবে যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে সংসার নির্বাহ করেন। ক্লাস এইট পাস নাজেমা, আবদুল্লাহ্‌র মা, সংসারকে নিজের শ্রম দিয়ে আগলে রাখেন। বাদিরুদ্দিন-নাজেমা দুই পুত্র ও দুই কন্যার জনক-জননী। চার সন্তানই পড়াশোনা করে। সবার বড়ো আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্‌র আব্বা-চাচারা সাত জন। তাঁরাও দিনমজুর। এমন পরিবারের ছেলের ডাক্তার হওয়ার কথা নয়। তবু যে ডাক্তার হতে চলেছে, তার প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল আবদুল্লাহ্‌র এক মামার হাত ধরে। আবদুল্লাহ্ আল-আমীন মিশনের নামই শোনেনি। আবদুল্লাহ্‌র পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে তার মামা পরামর্শ দিয়েছিল, আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার। তিনিই ফর্ম ফিলআপ করে ভর্তির পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে আল-আমীন মিশনে পড়ার সুযোগ পায় সে। আবদুল্লাহ্ আল-আমীন মিশনে পড়েছে একাদশ শ্রেণি থেকে। গ্রামের স্কুল থেকে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করে সে আল-আমীন মিশনে আসে। মালদা শাখায় পড়াশোনা করে ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮২.৪ শতাংশ নম্বর। এরপর আল-আমীন মিশনের সহপাঠীদের দেখে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে নিট-কোচিং নেওয়া শুরু করে। প্রথম বছর নিউটাউন ক্যাম্পাসে। ২০১৯ সালের নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক আসে ১ লক্ষ ৪২ হাজারের মতো। এরপর আবদুল্লাহ্ পাঁচুড় শাখায় আসে। ২০২০ সালের লকডাউনের ডামাডোলে তীরে এসে তরী ডুবে যায় বলা চলে। র‍্যাঙ্ক হয় ৫৬ হাজারের মতো। আরও এক বছর পড়াশোনা করে ২০২১ সালে তার সর্বভারতীয় নিট র‍্যাঙ্ক হয় ৩০৩৪! তিন-তিন বছর সময় কেন লাগল? আবদুল্লাহ্ জানায়, "প্রথমত, ইলেভেন-টুয়েলভে কম পড়া হয়েছিল। নিউটাউনের এক বছর তাই বেস তৈরিতে চলে যায়। লকডাউন পরের বছরের জন্য বড়ো ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়।" যারা নিটের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাদের কীভাবে তৈরি হতে বলবে, এই প্রশ্নের উত্তরে সে যা জানায়, তা আসলে পাঁচুড় শাখার সুপারিনটেনডেন্ট মহম্মদ সাব্বির সরকারের পরামর্শ, "বইয়ের সংখ্যা বাড়াবি না, রিভিশন বাড়াবি। আর যত পারবি মক দিবি।" সেই পরামর্শ মেনে আবদুল্লাহ্ পরীক্ষার শেষ

আড়াই মাসে ৭০-টার মতো মকটেস্ট দিয়েছিল। আল-আমীন মিশন যে আবদুল্লাহ্‌কে বেতনে বিশেষ ছাড় দিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছে, তা বুঝতে পারছেন হয়তো অনেকেই। এক তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে সে পড়েছে। আবদুল্লাহ্‌র পরিশ্রম আর আল-আমীন মিশনের আর্থিক সহায়তা, কোয়ালিটি এডুকেশন দেওয়া— এসবের সম্মিলিত ফল নিটে তার ৩০৩৪ র‍্যাঙ্ক। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করার পর এবার সে স্বপ্ন দেখছে রেডিয়োলজিতে এম.ডি. করার। বড়ো স্বপ্ন দেখছে আবদুল্লাহ্‌। বড়ো স্বপ্ন দেখার সাহস জুগিয়েছে আল-আমীন মিশন।

সোনিয়া দুবে

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩১৪২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৬০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

২০২১ সালের নিটে আল-আমীন মিশনের সফল আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে সবার ওপরে থাকা নামটি হল সোনিয়া দুবে। সোনিয়ার নিট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৩১৪২।

"ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়ে, ভবিষ্যতে কী হতে চাও"— এমন প্রশ্ন শুনে অনেকে জানায় বিভিন্ন দিকের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হওয়ার কথা। কিন্তু সোনিয়া জানাল, সে খুব খুব ভালো চিকিৎসক হতে চায়। চারিদিকে এত ডাক্তারের মাঝে তাকে যেন আলাদাভাবে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এই ক-টা কথার মধ্যেই সোনিয়া নিজের পরিচয়টা তুলে ধরেছে।

মালদা জেলার কালিয়াচক থানার নাজিরপুর গ্রামের মেয়ে সোনিয়া গ্রামের সরকারি স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৯৪.৬৬ শতাংশ নম্বর। তার প্রাপ্ত নম্বরই বলে দেয় কতটা মেধাবী পড়ুয়া সে। ২০২০ সালে আল-আমীনে দু-বছর পড়াশোনা-শেষে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছিল ৯৩.২ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং নিট পরীক্ষায় উজ্জ্বল এবং ধারাবাহিক সাফল্য থেকে বোঝার উপায় নেই যে, মেধাবী সোনিয়ার জীবনের ওপর দিয়ে বিরাট এক ঝড় বয়ে গেছে।

২০১৫ সালে ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় সে তার পিতাকে হারায়। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে সোনিয়ার পিতা নাজির আলি মারা যান। তিনি গ্রামেই একটি স্কুল চালাতেন। সোনিয়ার মা ফরিদা ইয়াসমিন তার পিতার মতোই স্নাতক, আইসিডিএস-কর্মী। পিতার অকালমৃত্যুর ঝড় সামলে পড়াশোনা চালিয়েছে সোনিয়া। আল-আমীন মিশনে সে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। পড়েছে আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায়। রানিং ইয়ারে সোনিয়ার নিট র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৯৪ হাজার। নিটের কোচিঙের জন্য ভর্তি হলেও আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় মাত্র মাস তিনেক থাকতে পেরেছিল হঠাৎ লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে। বাড়িতে থেকে অনলাইনে ক্লাস করার পাশাপাশি সেল্ফ-স্টাডি করেই এমন চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছে সোনিয়া।

সে জানিয়েছে তার ইলেভেন-টুয়েলভের পড়াটাই বিরাট কাজে এসেছে। তাই অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সে ক্লাস ইলেভেন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। পড়াশোনা ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয় সে ভালোবাসে না জানিয়েছে। পড়াশোনাকে কীভাবে গ্রহণ

করলে এটা বলা যায়, এটা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি তার সাফল্যের সূত্রও লুকিয়ে আছে এই কথার মধ্যে। সোনিয়া উচ্চতর পড়াশোনার লক্ষে ইতোমধ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।

আব্দুল আজিজ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৩২২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৬৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

সংখ্যালঘু মুসলমানদের চাকরির দাবিদাওয়া ওঠার ক্ষেত্রে একসময় অনেকেই বলে থাকেন, মুসলমানদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষিত প্রার্থীর নাকি বিরাট আকাল। কিন্তু কথাটা যে অনেকাংশে ঠিক নয়, তা প্রমাণ করতে বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের মতো অনেককেই হাজির করানো যায়। আবুল কালাম সাহেব বি.কম. পাস করার পর স্পেশাল বি.এ. করেছেন। পরে এম.এ.। তিনি এখন মুরারইয়ে রোডের ওপর মুরগির মাংসের দোকান চালান। শিক্ষা অর্জনকে তিনি সরাসরি কাজে লাগাতে পারেননি, তবে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন বলা যাবে না। তাঁর বারো আনা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়েছে পরিবার। পরবর্তী প্রজন্ম প্রাপ্য ছিনিয়ে আনার পর্যায়ে নিজেকে নিয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে।

আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ছেলে আব্দুল আজিজ ডাক্তারি পড়ার প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে ৩৩২২। এই অধিকার অর্জনে উপযুক্ত সঙ্গা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে আল-আমীন মিশন। আব্দুল আজিজ আল-আমীন মিশনে আসে মাধ্যমিক দেওয়ার পর। ২০১৮ সালে গ্রামের হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৯৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। মহকুমার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর ছিল আজিজের। হাজি মহম্মদ মহসিন স্কলারশিপ পেয়েছিল রাজ্য সরকারের থেকে। বরাবরের মেধাবী আজিজ আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। মেধাবী আজিজকে আল-আমীন মিশন প্রায় বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ফ্রি-কোচিং স্কিমের সুযোগ পেয়েছিল সে। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৬৪১৭৭।

নিট পরীক্ষায় ভালো র‍্যাঙ্ক করতে গেলে কী করা দরকার, এই প্রশ্নের উত্তরে আজিজ জানিয়েছে, “যত বেশি রিভাইজ দেবে তত ভালো। অন্তত সাত-আট বার দিতে হবে। আর ইলেভেন থেকেই এনসিইআরটির বই পড়তে হবে। ডাক্তারি পড়া লক্ষ্য হলে উচ্চ-মাধ্যমিককে তত গুরুত্ব না দিয়ে কীভাবে নিট পাওয়া যাবে, সেটা ভেবে পড়াশোনা করতে হবে ক্লাস ইলেভেন থেকেই। তাহলে রানিং ইয়ারে নিট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে অনেকটা।”

রমজান আলি খান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩৯০৭, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৮৬

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

২০২১ সালের নিটে আল-আমীন মিশনের ছাত্র রমজান আলি

খান ৩৯০৭ র‍্যাঙ্ক করেছে। তার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার আঙারিয়া গ্রামে। রমজানের পিতা আবদার আলি খান পড়াশোনা জানেন না। চাষবাস করে সংসার চালান। রমজানের মা মানোয়ারা খানও পড়াশোনা জানেন না। রমজানরা তিন ভাই চার বোন। চার বোনের দু-জনের বিয়ে হয়ে গেছে, দু-জন পড়ছে। তিন ভাইয়ের মধ্যে রমজান ছোটো। বড়োভাই আব্বাস আলি খান বি.এসসি. পাস। টিউশনি পড়ান। মেজোভাই উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। এই পরিবারের ছেলে রমজান এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হতে চলেছে আল-আমীন মিশনের হাত ধরে। রমজান ২০১৭ সালে গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮১ শতাংশ নম্বর। এরপর উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করার জন্য আল-আমীন মিশনের মেদিনীপুর শাখায় ভর্তি হয়। দু-বছর আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করার পর মাধ্যমিকের তুলনায় অধিকতর কঠিন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতে অনেকটা বেশি নম্বর হাসিল করে। ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৭.২ শতাংশ নম্বর। এরপর ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার লক্ষে নিটের কোচিং নিতে শুরু করে। প্রথমে কিছুদিন বর্ধমানের মেমারি শাখায় কোচিং নেওয়ার পর ওখান থেকে কলকাতার নিউটাউন ক্যাম্পাসে আসে। ২০২০ সালের নিটে রমজান ৭২০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিল ৫৩৩ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৬১ হাজারের মতো। ২০২১ সালে কোচিঙের জন্য উলুবেড়িয়া শাখায় এসেছিল রমজান। কিন্তু ওখানে মাত্র দু-মাস ক্লাস করার পর লকডাউনের কবলে পড়ে সব বন্ধ হয়ে যায়। ফলে অনলাইন ক্লাস, বাড়িতে পড়াশোনা আর আল-আমীন মিশনের মকটেস্ট— এভাবেই নিরলস পরিশ্রম করে ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে ৩৯০৭ র‍্যাঙ্ক করে সকলকে চমকে দিয়েছে রমজান। নিরক্ষর পিতামাতার, কৃষকপরিবারের সন্তান রমজান আলি খান বর্তমানে রাজ্যের সেরা মেডিকেল কলেজ— কলকাতা মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ছে। রমজান আলির এই অগ্রযাত্রায় আল-আমীন মিশনের ভূমিকা কতটুকু? জানুন রমজানের কথা থেকেই— “মিশন না থাকলে ডাক্তার হওয়া তো অনেক পরের কথা, বিজ্ঞান নিয়েই পড়া হত না আমার। কারণ, যা খরচ, তা আমার পরিবার বহন করতে পারত না। আব্বা চাষবাসে শ্রম দিয়ে যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে ৭ সন্তান-সহ ৯ জনের সংসার টানাই কঠিন। সেখানে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার খরচ কীভাবে আসত! আমি মিশনে একাদশ শ্রেণিতে পড়েছি মাসিক ৩৪০ টাকা বেতনে, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়েছি ৫৪০ টাকা বেতনে। আর নিট-কোচিং নিয়েছি ১৫০০ টাকার মতো বেতন দিয়ে। পাঁচ বছর মিশন আমাকে প্রায় বিনা বেতনে পড়িয়েছে বলা যায়।” গ্রাম থেকে দু-একজন ডাক্তার হয়েছেন। তাঁদের দেখে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন বুকে নিয়ে মিশনে এসেছিল রমজান। তার পরিশ্রম আর আল-আমীনের সহায়তায় সে-স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু চৌকাঠ পার হয়ে, এবার স্বপ্ন দেখছে নিউরো সার্জন হওয়ার। সে-স্বপ্ন যে সফল হবে, তা রমজানের অতীত লড়াইয়ের দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়।

সামিরুদ্দিন সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪১৪৭, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১০০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার দিগোরি গ্রামের টিনের চালের মাটির ঘরটা আনন্দের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে-ছেলেটাকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছে গোটা পরিবার, সে নিটে সর্বভারতীয় স্তরে ৪১৪৭ র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। এমন আনন্দের দিনে তবু সবার মনে একটা চাপা দুঃখ বিরাজ করছে।

মাত্র দু-বছর আগে, ২০১৯ সালে ছেলেটি পিতৃহারা হয়েছে। তার পিতা জয়নাল আবেদিন ইলেকট্রিক শকে অকালে মারা গেলে গোটা পরিবার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। দুই পুত্র, এক কন্যা আর তাদের মা— পরিবারের এই চার জনকে হঠাৎ অসম লড়াইয়ের মুখোমুখি পড়তে হয়। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার লড়াই শুরু করে সকলে। সেই লড়াই সফল করতে পাশে পায় আল-আমীন মিশনকে।

৪১৪৭ র‍্যাঙ্ক-করা ছাত্রটির নাম সামিরুদ্দিন সেখ। নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬৫০ নম্বর। সামিরুদ্দিন আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস এইট থেকে। সামিরুদ্দিনের কৃষিজীবী পিতা জয়নাল আবেদিন সাহেব একবুক স্বপ্ন নিয়ে আল-আমীন মিশনে নিয়ে এসেছিলেন ছেলেকে। আল-আমীন মিশন মাসে মাত্র ১০৯০ টাকা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়ায় খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। সেই খুশি বহু গুণ বেড়েছিল সামিরুদ্দিন ২০১৮ সালে যখন মাধ্যমিকে প্রায় ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে।

ছেলের পরের সাফল্য আর তিনি দেখে যেতে পারেননি। সামিরুদ্দিনের ইলেভেনের ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে, বাংলা পরীক্ষা হওয়ার দিন মারা যান তিনি। পুরো আকাশ ভেঙে পড়ে গোটা পরিবারের মাথার ওপর। বেঁচে থাকার অবলম্বন বিঘে তিনেক চাষের জমি। কিন্তু সেই জমি দেখাশোনা করবেন কে? মা, বোন তো পারবেন না। দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ছোটোভাই আলাউদ্দিন। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি চাষবাসও তিনি দেখেন। ছোটোভাই পুরো পরিবারের দায়িত্ব তুলে নিয়েও দাদার পড়াশোনার ওপর যাতে কোনো আঁচ না লাগে, তা নিয়ে সতর্ক থাকেন। মা-বোন-ভাইয়ের লড়াইয়ের ফসল সামিরুদ্দিন সেখের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া। ২০২০ সালে সামিরুদ্দিন উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাধ্যমিকের চেয়েও ভালো ফল করেছিল। পেয়েছিল ৯৫ শতাংশ নম্বর। পিতার অকালপ্রয়াণ কঠিন বাস্তবের মুখে দাঁড় করিয়েছিল তাকে। ভেবেছিল ভালো পড়াশোনা করা ছাড়া তার সামনে আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। পুরো পরিবারকে প্রতিদান দেওয়া হবে এটাই। তা ছাড়া পিতার স্বপ্ন সাকার করলে তবেই পিতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। সেই ভাবনার ফসল পরীক্ষায় ভালো ফল।

“ভালো নিট র‍্যাঙ্ক করতে কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছ?”— এই প্রশ্নের উত্তরে সামিরুদ্দিন জানায়, “প্রচুর পড়েছি। পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই ভেবে সবসময় পড়ার মধ্যেই থাকতাম। একটু ঢিলে দিলে সেটা মেকআপ করতে চাপে পড়ে যাব, এই ভয়ে একটানা পড়েছি। কনটিনিউ একভাবে পড়েছি।” সামিরুদ্দিন মনে করে যদি ভালো পরিবেশ, ভালো

বন্ধুবৃত্ত ও ভালো শিক্ষক দিয়ে আল-আমীন মিশন পাশে না দাঁড়াত তাহলে তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন হয়তো পূরণ হত না।

সাহানাজ খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৩৭৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১০৬

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

সাহানাজ খাতুন ২০২১ সালে নিটে সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করেছে ৪৩৭৫। আল-আমীন মিশনের আবাসিক কোচিং নিয়ে সফল হওয়া ছাত্রীদের মধ্যে সে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। সাহানাজের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আমডাঙা থানার রংমহল গ্রামে। বাবা-মা, এক ভাই ও এক বোনকে নিয়ে মোট পাঁচ জনের পরিবার। পিতা মনিরুল ইসলাম বি.এ. পাস, নিজস্ব কিছু জমিতে চাষবাস করার পাশাপাশি একটা ওষুধের দোকান চালান। মা জামিরুন বিবি বি.এসসি. পাস। তিনি গৃহবধূ, কোনো অর্থ উপার্জনের কাজের সঙ্গে যুক্ত নন।

সাহানাজ গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক দিয়েছিল ২০১৬ সালে। পেয়েছিল ৮৫ শতাংশ নম্বর। এরপর একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় ভর্তি হয়। ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে পেয়েছিল মাধ্যমিকের মতোই, ৮৫ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষা দিয়ে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল এক লাখের বেশি। সাহানাজ নিট কোচিং নিতে শুরু করে খলতপুর শাখায়। ২০১৯ সালে নিট র‍্যাঙ্ক হয় ৫১ হাজারের সামান্য বেশি। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পেলেও ভর্তি হয়নি সে। আরও এক বছর দেখতে চায়। ২০২০ সালে র‍্যাঙ্ক আরও একটু কমে হল ৪০২৯৮। এ-বার কলকাতার আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হয়ে গেল বি.ডি.এস. পড়তে। ভর্তি হলেও কোনো ক্লাসই হয়নি কলেজে, লকডাউনের কারণে। বাড়িতেই ছিল সারাবছর। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ-বছরের নিট পরীক্ষায় সে আশাতীত ভলো ফল করেছে।

অবশেষে এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন সফল হয়েছে সাহানাজের। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সাহানাজের পাশে দাঁড়িয়েছে আল-আমীন মিশন। প্রায় অর্ধেক বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে তাকে। ডাক্তারি পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রতিপ্রশ্নে উত্তর দেয় সাহানাজ। সে জিজ্ঞাসা করে, "একজন মেয়ের কাছে, আজকের দিনে ডাক্তারি পড়ার চেয়ে ভালো পেশা আর কী আছে?"

সাহীন আলম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৩৯৬, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১০৮

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

বীরভূম জেলার নলহাটি থানার ভবানীপুর গ্রামের সাহীন আলম আল-আমীন মিশনের নিটে সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একজন। ২০২১-এর নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৪৩৯৬। সাহীন ক্লাস সেভেন থেকে আল-আমীন মিশনে পড়েছে। সাহীনের পিতা ইমামুল হাসান ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছেন। চাষবাস করেন। মা তুহিনা মাধ্যমিক পাস, গৃহবধূ। পরিবারের দুই সন্তানের ছোটোটির

নাম ইরফান হাবিব, দশম শ্রেণির ছাত্র। সাহীন ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত পড়েছে আল-আমীনের কেলেজোড়া শাখায়। ওই শাখার প্রথম ব্যাচ ছিল সাহীনরা। নিজেদের বিঘে চারেক জমিতে চাষবাস করা ইমামুল হাসান সাহেব তাঁর ছেলেকে আল-আমীন মিশনে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলেন মাসিক মাত্র ৫৯০ টাকা বেতন দিয়ে।

২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সাহীন পেয়েছিল ৯১ শতাংশের বেশি নম্বর। এরপর সাহীন উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিট কোচিং— এই তিন বছর পড়েছে আল-আমীন মিশনের হাওড়ার খলিশানি শাখায়। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাহীন পেয়েছে মাধ্যমিকের মতোই— ৯১ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষায় বসে সাহীনের অবিশ্বাস্য রকমের খারাপ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল। দু-লাখের কাছাকাছি র‍্যাঙ্ক হয়েছিল। ২০২১ সালে মাত্র মাস চারেকের মতো আবাসিক থেকে নিট কোচিং নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। তারপর লকডাউনে বাড়িতে থেকে অনলাইনে ক্লাস হয়েছিল। বাড়িতে প্র্যাকটিস সেট থেকে প্রচুর প্র্যাকটিস করেছে। ইউটিউবেও কিছু ক্লাস দেখেছে। নিয়মিত পড়াশোনা করলে কেমন ফল হয়, তার উদাহরণ সাহীন আলম।

অনেকে এক লাখ দেড় লাখের ওপর র‍্যাঙ্ক হলে ভরসা পায় না সফল হওয়ার ক্ষেত্রে। এমন ছেলে-মেয়েদের সামনেও সাহীনের সাফল্য উদাহরণ। দু-লাখের ওপর র‍্যাঙ্ক থেকে ৪৩৯৬ র‍্যাঙ্ক একটা অবিশ্বাস্য সাফল্য বই কী! সাহীন নিজেও এত ভালো র‍্যাঙ্ক হবে বলে আশা করেনি। সর্বোচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করা চাষি-পরিবারের সন্তান ডাক্তার হতে চলেছে। আল-আমীন মিশন পাশে দাঁড়ানোতেই এমন উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। আল-আমীন মিশন উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিট কোচিং— এই তিন বছর এক চতুর্থাংশ বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে সাহীনকে। আর্থিক ছাড়ের চেয়েও বড়ো বিষয়, সাহীন মনে করে, উপযুক্ত গাইড, শিক্ষালাভের পরিবেশ প্রদান— যা পয়সা দিয়েও গ্রামে পাওয়া কঠিন ছিল।

মিজানুল ইসলাম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৪৫৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১১১

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের ব্যবসায়ী ও শ্রমনিবিড় অংশের মানুষের কাছে একটা বিরাট ভরসার জায়গা আল-আমীন মিশন, এ-কথা সত্য। সমাজের উচ্চশিক্ষিত মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থানকারী মানুষদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে আল-আমীন। অর্থাৎ, একদম মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষদের থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চস্তরে থাকা মানুষদেরও ভরসাস্থল। আল-আমীন মিশনে সর্বস্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিই তার প্রমাণ। অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং রাজনীতিবিদদের কাছেও নিজেদের সন্তানকে লালন করার উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে আল-আমীন মিশন।

আসামের হাজি আনসার আলি কলেজে শিক্ষকতা করেন মোজাহারুল ইসলাম সাহেব। তিনি অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর। তাঁর স্ত্রী আবেরা খাতুন স্নাতক। তাঁরা তাঁদের একমাত্র সন্তান মিজানুল ইসলামের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে আল-আমীন মিশনের ওপরেই

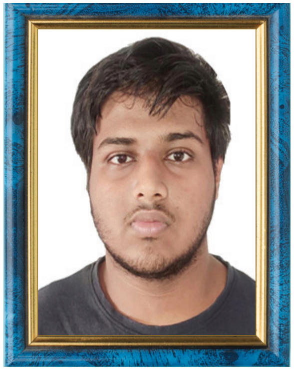

ভরসা রেখেছিলেন। মিজানুল ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৭২০-র মধ্যে ৬৪৭ নম্বর পেয়ে ৪৪৫৮ র‍্যাঙ্ক করেছে। মিজানুল আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস নাইন থেকে।

মিজানুলের আব্বা আসামে অধ্যাপনা করলেও তাঁদের পৈতৃক বাসস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার এন টি পি সি মোড়ে। গ্রামের স্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় ভর্তি হয় সে। ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছিল ৯১ শতাংশের মতো নম্বর। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যস্তরে দশম স্থান পায় মিজানুল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছিল।

মিজানুলের নানা এবং মামাও ডাক্তার। তাঁদের দেখেই ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন তৈরি হয় মনে। সেই লক্ষ্য পূরণে আল-আমীন মিশনকেই বেছে নেয় তার পরিবার। নাইন থেকে টুয়েলভ আর এক বছর নিট-কোচিং— মোট পাঁচ বছর আল-আমীন মিশনে পড়েছে মিজানুল। তার চোখে আল-আমীন মিশনের সবচেয়ে ভালো দিক হল বন্ধুদের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রতিযোগিতা। আর সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আনাগোনা থাকায় সামাজিক মেলামেশা ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠার সুযোগ মিশনে পাওয়া যায়, যা অন্য কোনো জায়গায় পড়লে পাওয়া যেত না। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় মিজানুলকে জিজ্ঞাসা করা হয়, বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করলেও কি এমন র‍্যাঙ্ক করা যেত? এই প্রশ্নে সে জানায়, “সেটা সম্ভব হত না। লকডাউনের কারণে যদিও আমরা বেশিরভাগ সময়টা বাড়িতে পড়েছি। তবু এ-কথা বলব, মিশনের মাধ্যমে যদি জানতে না পারতাম কী পড়ব, কতটা পড়ব, কীভাবে পড়ব— তাহলে লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন ছিল।” মিশন পথ দেখিয়েছে, সেই পথে হেঁটে সাফল্য পেয়েছে। মিজানুল রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৫১৭। আরও এক বছর নিটের জন্য নিবিড় পরিশ্রম করেই ভালো র‍্যাঙ্ক করতে পেরেছে। ভুল লিখলাম, মিজানুল জানিয়েছে— এই লক্ষ্য অর্জনে মিশনে পড়া পুরো পাঁচ বছরই অনেক কিছু বর্জন করতে হয়েছিল। সোস্যাল মিডিয়া থেকে, প্রিয় আইপিএলের খেলা দেখা থেকে বা আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। এত কিছু ত্যাগের ফলই রাজ্যে দশম স্থান আর নিটে চমকপ্রদ র‍্যাঙ্ক করার সাফল্য অর্জন। বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ছে মিজানুল। ভবিষ্যতে সে সার্জন হতে চায়।

নূর হাসান গাজী

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৫৮১, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১১৭

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

হাওড়া জেলার নয়াবাজে আল-আমীন মিশনের নিট-কোচিং দেওয়া হয় দুটো ইউনিটে। নয়াবাজ থেকে ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৫৭০ নম্বরের ওপরে নম্বর পাওয়া পড়ুয়া, অর্থাৎ সরকারি কলেজে যারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে বলে ধরে নেওয়া যায়, তেমন সফল পড়ুয়ার সংখ্যা ৭৬ জন। ঠিকই পড়ছেন ৭৬ জন— একটা কেন্দ্র থেকে। শুধু নয়াবাজ কেন্দ্র কেন, আল-আমীন মিশনের প্রতি বছরের নিট সাফল্য নিয়ে অনেকের মনে অপার সন্দিগ্ধতা দেখা যায়। কীভাবে সম্ভব? প্রশ্নটা রাখা হয়েছিল এ-বারের নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে ৪৫৮১ র‍্যাঙ্ক-করা নূর হাসান গাজীর কাছে। তার

উত্তরটা জানলেই সাফল্যের রহস্য অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে আশা করা যায়। "কোনো জাদু নেই, আছে ছেলে-মেয়েদের ডেডিকেশন। কত ইচ্ছে, ভালো লাগা ত্যাগ করে নিজেদের সমস্ত শক্তিকে নিট পাওয়ার দিকে নিয়োজিত করে, তা চোখে না দেখলে বোঝা কঠিন। মিশনে এমন ছেলে-মেয়েও থাকে, যারা বছরের সবচেয়ে খুশির উৎসব ইদেও বাড়ি যায় না। তাহলে বুঝুন কীভাবে মনকে তৈরি করে।" নূর হাসান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার উস্থি থানার কালিকাপোতা গ্রামের সন্তান। সে ২০২১ সালের নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৪৬ নম্বর পেয়েছে। বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পাঠরত। নূর হাসান আর-একটা তথ্য জানাল— কলকাতা মেডিকেল কলেজ, যা রাজ্যের এক নম্বর মেডিকেল কলেজ হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে তাদের ব্যাচে পাঠরত ২৫০ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৩৬ জন আল-আমীন মিশনের। এই তথ্য জেনে ধর্মপ্রিয় কেউ হয়তো 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবেন। কিন্তু এই অর্জনে আল-আমীন মিশন ও তার ছাত্র-ছাত্রীদের যে কত ত্যাগ ও লড়াই আছে, তা অনুভব করা মুখের কথা নয়।

এবার আসি নূর হাসান গাজীর ব্যক্তিগত পরিচয়ের বৃত্তে। তার আব্বা আব্দুর রসিদ গাজী উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। পোস্ট অফিসে পিয়ন হিসেবে কাজ করেন। ক্লাস এইট পাস নূর ফাতেহা গাজী গৃহবধূ। নূর হাসানরা পাঁচ ভাইবোন। ভাইদের মধ্যে নূর হাসান বড়ো। তিন দিদির মধ্যে মেজো বিবাহিত। বড়োদিদি ইংরেজিতে এম.এ. পাস, বর্তমানে ডব্লিউ.বি.সি.এস.-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছোটোদিদিও ইংরেজিতে অনার্স পাস করে ডি.এল.এড. করেছেন। ছোটোভাই অন্য একটি আবাসিক মিশনে পড়ে। নূর হাসানের আব্বা খুব বেশি বেতন পান না, যা পান, তা দিয়ে সংসারটা কোনোরকমে চলে আর দুই ছেলের পড়াশোনার খরচ জোগান। আর নূর হাসানের দুই দিদি নিজেরা টিউশনি পড়িয়ে নিজেদের পড়াশোনার খরচ চালান। গ্রামবাংলার সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ এগোচ্ছে, অনেকে দেখছেন। কিন্তু কীভাবে এগোচ্ছে, তা অনেকের মতো আমরাও জানতে পারতাম না, নূর হাসানের মতো ছেলেদের সঙ্গে কথা না বললে। 'আল-আমীন বার্তা'য়, বা আল-আমীন মিশন প্রকাশিত নানা পুস্তিকায় এসব ছবি তোলা রইল ভবিষ্যতের জন্য। কীভাবে জেগে উঠেছিল, তার ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে।

নূর হাসান আল-আমীন মিশনে পড়েছে একাদশ শ্রেণি থেকে। ২০১৮ সালে গ্রামের স্কুল থেকে ৯৪ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করেছিল সে। মেধাবী নূর হাসানকে আল-আমীন মিশন অর্ধেকেরও কম বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়। নয়াবাজ শাখায় দু-বছর পড়ার পর, ২০২০ সালে সে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর। ২০২০ সালে, অর্থাৎ রানিং ইয়ারের নিটে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৪৯১৬৭। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পেলেও ভর্তি হয়নি সে। লকডাউনের মাঝে নানা প্রতিকূল পরিবেশ টপকে ২০২১ সালে তার র‍্যাঙ্ক হয় ৪৫৮১। খেলাধুলা প্রিয় হলেও নূর হাসান মাধ্যমিকের পর আর খেলেনি। নিট দেওয়ার পরই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। নূর হাসান রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ঘুমাত। বাকি সময়টা যতটা পারা যায় পড়াশোনায় ব্যয় করত। প্রতিদিন তিনটি বিষয় পড়ত, কোনো বিষয় টানা পড়ত না। নিটের আগে ৫৫-টা মকটেস্ট দিয়েছে। এত পরিশ্রম করে সফল

হওয়ার পরও নূর হাসান মনে করে আল-আমীন মিশন না থাকলে হয়তো র‍্যাঙ্ক হত, কিন্তু এত ভালো র‍্যাঙ্ক হত না।

সাহিদ আহমেদ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৫৮৬, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১১৮

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

সাহিদ আহমেদ মালদা জেলার কালিয়াচক থানার কুশাবাড়ি গ্রামের ছেলে। সাহিদের পিতা মহম্মদ হিফজুর রহমানের পড়াশোনা উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত। ব্যাবসা করেন। মা সায়েমা বিবি মাধ্যমিক পাস। গৃহকর্ম নিয়েই থাকেন। দুই পুত্রসন্তানকে নিয়ে চার জনের ছোটো পরিবার। বড়োসন্তান সাহিদ আহমেদ আল-আমীন মিশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বেলপুকুর শাখার ছাত্র হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে পেয়েছিল ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর। এরপর ডাক্তারি পড়ার লক্ষকে সামনে রেখে হাওড়ার সাঁতরাগাছি শাখায় এসে উচ্চ-মাধ্যমিকের পঠন-পাঠন শুরু করে। ২০২০ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৮.৪ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট দিয়ে সাহিদ ৭২০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিল ৫০৩ নম্বর। র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৮৬ হাজারের মতো। আরও এক বছর শুধু নিটের কোচিং নেয়। এক বছরের কঠিন পরিশ্রমের ফল হল ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৪৫৮৬ র‍্যাঙ্ক। সাহিদ বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পড়ছে। নিটের সাফল্য পেতে সাহিদের পরামর্শ— টুয়েলভে উঠে প্রথম থেকেই এনসিইআরটির বইগুলো পড়া শুরু করে দিতে হবে। ভালো রেজাল্ট করতে যত বেশি মকটেস্ট দেবে ততই ভালো। পরীক্ষার সময় মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দিতে হবে। এম.বি.বি.এস. শেষ করে এম.ডি. করতে চায় সাহিদ। হতে চায় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। কারণ, বাচ্চাদের খুব ভালো লাগে তার। সাহিদের মতে আল-আমীন মিশন থেকে পাওয়া সেরা জিনিসটা হল পড়াশোনার পরিবেশ। দশ জন ছেলে পাশাপাশি আছে, দশ জনই পড়াশোনায় ভালো, নিট-পরীক্ষার্থী। তারা পরস্পর আলোচনা করে নিজেদের মধ্যেই চাপা প্রতিযোগিতা নিয়ে পড়াশোনা করছে— এমন পরিবেশ গ্রামের দিকে হাজার চেষ্টা করেও পাওয়া যাবে না। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে সাহিদ ডাক্তার হতে চলেছে। সে-ই তার এলাকার প্রথম সরকারি কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার হবে। সাহিদের বাবা-মা চান, তাঁদের ছোটোছেলেও বড়োছেলের মতো সফল হয়ে সকলের মুখ উজ্জ্বল করুক। সেই প্রত্যাশাপূরণে তাঁরা ছোটোছেলেকেও আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেছেন। সাহিদের ছোটোভাই বর্তমানে বেলপুকুর শাখাতেই ক্লাস টেনে পড়ছে। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে একই পরিবারের একাধিক সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে— এমন বহু নজির ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। সাহিদদের দুই ভাইয়ের সফলতা সেই নজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, আশা করাই যায়।

ওয়াহিদা রহমান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৬১১, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১১৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

ওয়াহিদা রহমান। ২০২১ সালে নিটে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৪৬১১। আল-আমীন মিশনের সফলদের তালিকায় মেয়েদের মধ্যে ওয়াহিদা আছে তৃতীয় স্থানে। সর্বভারতীয় স্তরে ৪৬১১ র‍্যাঙ্ক মানে খুবই ভালো একটা র‍্যাঙ্ক। এমন একজন র‍্যাঙ্ককারীকে এম.বি.বি.এস.

পড়ার সুযোগ পাওয়ার জন্য চার বার পরীক্ষায় বসতে হয়েছে, বিষয়টা আন্দাজ করা কঠিন। সময় নষ্ট করার বিষয়ে ওয়াহিদা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ একটা কথা বলেছে। তার মত হল, "আজকের দিনে জেনারেল লাইনে পড়া মানে দীর্ঘ সময়ের যাত্রা। যাত্রা শেষ করে সম্মানজনক চাকরির জন্য অপেক্ষা করা বছরের পর বছর। আদৌ চাকরি হবে কি না, তাও নিশ্চিত নয়। নিট পরীক্ষা দিতে গিয়ে তিন বা চার বছর ব্যয় করার পর সফল হলে জীবন তৈরি হয়ে যাবে।" ওয়াহিদার এই যুক্তি উড়িয়ে দেওয়ার নয়।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার গোপালনগরের মেয়ে ওয়াহিদা ২০১৬ সালে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাস করার পর একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। ২০১৮ সালে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮৩ শতাংশ নম্বর। এক বছর নিটের প্রস্তুতি নিয়ে ২০১৯-এ র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৯৮ হাজারের বেশি। আরও এক বছর ব্যয় করে র‍্যাঙ্ক হল ৩৯০৩২। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ হল। ভর্তি হয়ে গেল আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে। কিন্তু মন পড়ে রইল এম.বি.বি.এস. পড়ার দিকে। তাই কলেজের ক্লাস না করে নিটের প্রস্তুতি চালিয়ে গেছে। চতুর্থ বারের চেষ্টায় এম.বি.বি.এস. পড়া নিশ্চিত করতে পেরেছে। ধৈর্য ধরে লেগে থাকার মানসিকতা বজায় রাখতে পারলে দেরি হলেও সাফল্য যে পাওয়া যায়, তার উদাহরণ ওয়াহিদা।

তবে মেধাবী ওয়াহিদাও চার বছর অপেক্ষা করার পেছনের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেছে দুটো কারণ। এক, প্রথম থেকে এনসিইআরটির বই না-পড়া। দুই, হঠাৎ লকডাউন শুরু হয়ে পড়াশোনায় ছেদ পড়ে যাওয়া। ২০২০ সালে তীরে গিয়ে তরী ডুবে যাওয়ার পেছনের কারণ অনলাইন পড়াশোনায় সড়গড় হতে না-পারা।

ওয়াহিদা রহমানের পিতা রজব আলি মণ্ডল এম.এ. পাস, বি.এড.-ও করেছেন। স্থানীয় স্কুলে পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে চাকরি করতেন, সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছেন। মা আর্জিনা বেগম বি.এ. পাস, গৃহবধূ। ওয়াহিদার বোন গ্রামের স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। রজব সাহেব মেয়েকে ডাক্তার করার স্বপ্ন নিয়ে আল-আমীন মিশনে এসেছিলেন। দীর্ঘ লড়াইয়ে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। আল-আমীন মিশন দীর্ঘ পাঁচ বছর আর্থিক সহায়তা দিয়ে পাশে থেকেছে। এক তৃতীয়াংশ বেতন দিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে ওয়াহিদা। বি.ডি.এস.-এ ভর্তি হওয়ার পর পড়া ছেড়ে জমা দেওয়া ডকুমেন্টস ফেরত নিতে গেলে মোটা অঙ্কের অর্থ ফাইন দেওয়ার নিয়ম শুরু হয়েছে বেশ কয়েক বছর হল। সেই অঙ্কটা বর্তমানে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। ওয়াহিদার মতো অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এই বিরাট পরিমাণ অর্থ ক্ষতি স্বীকার করেও এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন সাকার করতে পিছপা হয় না। অনেক লড়াই করে যে-সাফল্য পেয়েছে সে, ওই আর্থিক ক্ষতির চেয়ে তা অনেক বড়ো।

আব্দুল হামিদ সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৮৯৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১২৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

জিয়াউল সেখ পড়াশোনা কিছুই জানেন না। তিনি যে নাম-সইটা করতে পারেন, তা আসলে দেখে ছবি আঁকা শেখার মতো। জিয়াউল সাহেবের স্ত্রী আলিয়ারা বিবিও পড়াশোনা জানেন না। জিয়াউল

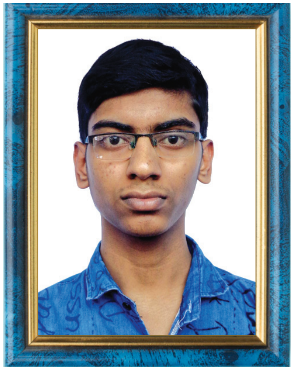

সাহেব রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। আগে কলকাতায় করতেন, এখন গ্রামেই করেন। এমন একটি পরিবারের সন্তান ডাক্তার হতে চলেছে, এ-কথা শুনলে অনেকে চমকে উঠবেন। কিন্তু আল-আমীন মিশনের কাছে এটা চমকে ওঠার মতো ঘটনা আর নয়। কারণ, গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে এমন অনেক পরিবারের ছেলে-মেয়ে তার ছায়ায় বড়ো হয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উচ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জিয়াউল সেখের বাড়ি বীরভূম জেলার পাইকর থানার ননগড় গ্রামে। তাঁর দুই সন্তান। বড়োটির নাম আব্দুল হামিদ সেখ। হামিদই নিট পরীক্ষায় ৪৮৯৫ র‍্যাঙ্ক করে ডাক্তার হওয়ার ছাড়পত্র পেয়েছে।

হামিদ আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল একাদশ শ্রেণিতে। ২০১৮ সালে গ্রামের স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে হামিদ পেয়েছিল ৯৪.৮ শতাংশ নম্বর। নম্বরের ওজনে বেশ ভারী মার্কসিট হাতে নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছিল আল-আমীন মিশনের উঠোনে। আল-আমীন মিশনে ভর্তি হওয়ার পেছনেও আবার এক গল্প আছে।

হামিদ গ্রামের যে-স্কুলে পড়ত, সেই স্কুলে ডেপুটেশনে ছ-মাসের জন্য একজন অঙ্কের শিক্ষক এসেছিলেন। নাম সফিক আহমেদ। তিনি আবার আল-আমীন মিশনেও শিক্ষকতা করেছেন কিছু দিন। ক্লাসের সেরা মেধাবী ছাত্রকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন আল-আমীন মিশনে ভর্তির বিষয়ে। শুধু পরামর্শই নয়, ভর্তির ফর্ম তুলে আনা থেকে ভর্তির পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত তদারকি করেছিলেন।

ভর্তির পরীক্ষায় পাস করার পর ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য মিশন থেকে ডাকা হলেও হামিদরা যায়নি। সফিক স্যার ভর্তির বিষয়ে কী হল— খবর নিতে গিয়ে জানতে পারেন বিষয়টা। প্রচণ্ড বকাবকি করেন। তিনি বলেন, “অনেকে চান্সই পায় না, আর চান্স পেয়েও আপনারা (হামিদের আব্বাকেই ফোন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই কথা হয়েছিল) যাচ্ছেন না।” স্যারের ফোন ছাড়ার পর ভুল বুঝতে পেরে পিতা-পুত্র তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে ট্রেনে চড়ে বসেন। গন্তব্য তখন আল-আমীন মিশন। বেলা ১২ টায় সফিক স্যারের ফোন, ২ টোয় ট্রেন ধরা আর সন্ধ্যা নাগাদ মিশনে পৌঁছোনো। পৌঁছে দেখলেন, ইন্টারভিউ আগের দিন থেকে শুরু হলেও চলছে তখনও, আরও এক-দু দিন চলবে। হামিদের নাম ছিল প্রথমের দিকের তালিকাতেই। তবু সবটা বলে ইন্টারভিউ দিয়ে মিশনে ভর্তি হয়ে গেল হামিদ। নয়াবাজ শাখায় পড়ার সুযোগ পেল। এক তৃতীয়াংশ বেতনে সে তিন বছর আল-আমীন মিশনে পড়েছে। ২০২০ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও প্রায় মাধ্যমিকের সমানই নম্বর পেয়ে পাস করে। পেয়েছিল ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে তার নিট র‍্যাঙ্ক হয় ৭০১৩৪। ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক এসেছে ৪৮৯৫।

হামিদ ভালো ফল করার ক্ষেত্রে মনে করে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করা দরকার। আর উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গেই নিটের প্রস্তুতিও সমানভাবে চালাতে হবে। আগে উচ্চ-মাধ্যমিকের সিলেবাস শেষ করে নিয়ে নিটের প্রস্তুতি শুরু করলে বুঝতে সুবিধা হবে। তাদের পরিবারের মতো পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জীবন বদলে আল-আমীন মিশনের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে হামিদ জানিয়েছে, “সংখ্যালঘু সাধারণ পরিবারের কল্যাণের জন্য মিশন যে-ভূমিকা পালন করে চলেছে, তাকে সাধুবাদ জানানোর জন্য কোনো বাক্যই যথেষ্ট নয়। যদি ভবিষ্যতে এই মহৎ উদ্যোগের পাশে থাকতে পারি

তাহলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করব।" আল-আমীন মিশন হামিদকে কতটা মুগ্ধ করেছে, তা আর বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

সেখ কবীর মহিউদ্দিন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৯০০, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৩০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আল-আমীন মিশন থেকে যারা নিট পরীক্ষায় সফল হয়, তাদের মধ্যে ক্লাস ফাইভ থেকে পড়া ছাত্র-ছাত্রী থাকে? এমন কথা বলেন কেউ কেউ। তাঁরা সম্ভবত আল-আমীন মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফল নিয়ে প্রতিবছর যে-লেখা প্রকাশিত হয়, তা পড়েন না। এমন প্রশ্নও করেন অনেকে, যারা ক্লাস ফাইভ থেকে পড়েছে, তারা নিট পরীক্ষায় এক বছর কোচিং নিয়েই কি সফল হয়ে যায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে এ-বারের সাফল্যকথায় আরও একটা উদাহরণ পেশ করাই যায়।

সেখ কবীর মহিউদ্দিন আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় ক্লাস ফাইভ থেকে পড়েছে। ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত

নম্বরের হার ছিল ৯৪ শতাংশ। ২০২০ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে আরও ভালো ফল করে, পায় ৯৬.৬ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে তার নিট র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৫ হাজারের মতো। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ হলেও সে পড়েনি, এম.বি.বি.এস. পড়ার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। লকডাউনের ডামাডোল না হলে হয়তো রানিং ইয়ারেই হয়ে যেত। অল্প কিছুদিন অফলাইন আর বেশিরভাগটা অনলাইনে কোচিং নিয়ে বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে তার র‍্যাঙ্ক হয় ৪৯০০।

কবীর মহিউদ্দিনের বাড়ি হাওড়া জেলার বাগনান থানার হাল্যান গ্রামে। মহিউদ্দিনের পিতা সেখ মীজানুর রহমান ইংরেজিতে এম.এ. পাস। ওষুধের ব্যাবসা করেন। মা কারিমা খাতুন বাংলা বিষয়ে সাম্মানিক স্নাতক। তিনি গৃহবধূ। মহিউদ্দিনরা তিন ভাই এক বোন। মহিউদ্দিন বড়ো। বোন আল-আমীন মিশনে নিট-কোচিং নিচ্ছে। পরের ভাই তানভির মেহেতাব আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় ক্লাস সেভেনে পড়ছে। পিতা ওষুধের ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত। চিকিৎসা পরিষেবার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত থাকায় ছোটো থেকেই ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে তৈরি হয়। সেই স্বপ্ন সফল করতে আল-আমীন মিশনকে বেছে নেন মহিউদ্দিনের মা-বাবা। আল-আমীন মিশন মেধাবী মহিউদ্দিনকে বেতনের প্রায় অর্ধেক ছাড় দিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়েছে। বর্তমানে সে মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় এম.বি.বি.এস. পড়ছে। ভবিষ্যতে সে রেডিয়োলজিস্ট হতে চায়। নিট প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মহিউদ্দিন একটু অন্যভাবে হেঁটেছে। অনেকে চোখ-কান বুজে এনসিইআরটির বই পড়ে প্রথম থেকেই। কিন্তু মহিউদ্দিনের পরামর্শ হল প্রথমে বাংলা বই পড়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে নিয়ে তারপর এনসিইআরটির বই পড়লে দ্রুত আয়ত্ত করা যাবে। মহিউদ্দিন প্রতিটা বিষয়ের নোট তৈরি করে পড়াশোনা করেছে। চ্যাপ্টার ওয়াইজ হাতে লিখে নোট তৈরি করে নিলে মনে রাখতে সুবিধা হবে। প্রথমে নোট বড়ো হতে পারে, কিন্তু সেখান থেকে আবার নোট সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এভাবে কি-সেনটেন্স থেকে কি-ওয়ার্ডে এলে খুব ছোটো নোট

হবে। যেগুলো ভুলে যাবে সেগুলো নোটে যুক্ত করে বার বার পড়লে মনে থাকবে বলে মনে করে মহিউদ্দিন। আর যত পারা যায় মকটেস্ট দেওয়ার কথা জানিয়েছে সে। এভাবেই নিজেকে তৈরি করে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৪৫ নম্বর পেয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে সেখ কবীর মহিউদ্দিন।

হেদায়েত নুর আলি

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৪৯৫৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৩৩

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

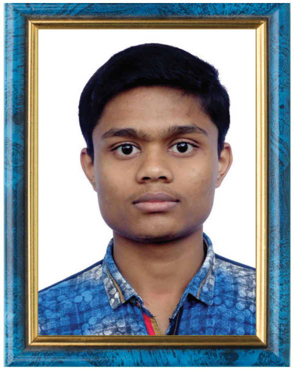

"আমার সাফল্যে মিশনের অবদান বিশাল। আমাদের সাফল্য, আমার বন্ধুদের সাফল্য দেখে এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে পরিবর্তন আসছে। অনেকেই তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মিশনে ভর্তি করিয়েছেন এবং সন্তানদের স্কুল-কলেজে ভর্তি করতে উৎসাহ বোধ করছেন।" এভাবেই নিজের ভাবনা জানাল মালদা জেলার কালিয়াচক থানার কারারি চাঁদপুর গ্রামের হেদায়েত নুর আলি। হেদায়েতের আব্বা মোহাম্মদ আতাউর রহমান ও মা জুলি বিবি, উভয়েই মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। একটি জুতোর দোকানের আয় দিয়েই তাঁদের সংসার চলে। তবুও দুই মেয়ে ও এক পুত্রের শিক্ষা নিয়ে প্রথম থেকেই দারুণ সচেতন তাঁরা। মিশনের প্রাক্তনী হেদায়েতের দিদি বর্তমানে বি.এড. পাঠরত এবং ছোটোবোন গ্রামের স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে।

প্রায় এক দশক মিশনে কাটিয়েছে হেদায়েত। বেলপুকুর শাখায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে শুরু করে গত বছর নয়াবাজ শাখায় নিটের কোচিং পর্যন্ত তার প্রত্যক্ষ মিশনজীবন। বেলপুকুর শাখা থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিকে ৮৭.৮ শতাংশ এবং ২০২০ সালে নয়াবাজ শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৪.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করার পর নয়াবাজ ক্যাম্পাসেই এক বছরের মেডিকেল কোচিং নেয় হেদায়েত। আল-আমীনের প্রাক্তনী গ্রামের দাদাদের উজ্জ্বল সাফল্যের কাহিনি সে ছোটো থেকেই শুনছে। হেদায়েতও স্বপ্ন দেখত ডাক্তার হওয়ার। কারণ, নয়াবাজ শাখায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ার সময় সে দেখেছে প্রত্যেক বছরই বহু দাদা নিটে দারুণভাবে সফল হচ্ছে। উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরেই হেদায়েত নিটে ৪৯৭ নম্বর পায়। সে জানায়, করোনার কারণে মিশনের হস্টেলে না থাকার জন্যই সে রানিং বর্ষে মেডিকেলে সফল হতে পারেনি। কিন্তু এ-বছর নিটে ৬৪৫ নম্বর পেয়ে আব্বা-মায়ের স্বপ্ন ও নিজের ইচ্ছাকে দারুণভাবেই উদ্‌যাপন করেছে।

পঞ্চম শ্রেণিতে হেদায়েতের মাসিক ফি ছিল ২৩৯০ টাকা এবং দশম শ্রেণিতে বেড়ে হয় ৩৩৯০ টাকা। একাদশ, দ্বাদশ এবং নিটের কোচিঙে হেদায়েত প্রায় পূর্ণ ফি দিয়েই পড়েছে। মধ্যবিত্ত পরিবার হওয়ায় এটি সামলানো সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা ছেলে-মেয়ের শিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু সমাজের অভিভাবকগণও কষ্ট স্বীকার করতে শুরু করেছেন। এটাই আশার আলো।

হেদায়েত তখনও মিশনে ভর্তি হয়নি, তার আগেই মোহাম্মদ আতাউর রহমান খলতপুরে সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই আলাপে উদ্‌বুদ্ধ ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। নয়াবাজের পড়াশোনার পরিবেশ, খন্দকার মহিউল হকের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও মোটিভেশন, শিক্ষক ও সিনিয়ার দাদাদের সহযোগিতা প্রভৃতিই

সাফল্যের প্রাথমিক উপাদান বলে মনে করে হেদায়েত। ফুটবল খেলতে এবং বই পড়তে ভালোবাসাই তার মুখ্য দুই শখ। নিটে এনসিইআরটির বইয়ের ভূমিকা প্রসঙ্গো হেদায়েতের অভিমত হল, একজন লেখকের ৫০০ পৃষ্ঠার বইয়ের চেয়ে ৫ জন লেখকের ১০০ পৃষ্ঠার বই ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বেশি অপরিহার্য।

আয়াতুল্লা হাবিবি

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫০১৩, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৩৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

উচ্চ-মাধ্যমিক মান আবুল মাজেন নিজেদের বিঘে তিনেক জমিতে চাষবাস করেই সংসার নির্বাহ করেন। নিজের নামটুকু সই করতে পারা সাহানাজ বিবিও এই সংগ্রামে সামিল। তাঁদেরই সন্তান আয়াতুল্লা হাবিবি। আয়াতুল্লার বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার আলিনগর গ্রামে। ২০১৬ সালে মাধ্যমিকে অনেকগুলো বিষয়ে লেটার মার্কস-সহ ৯০.১৪ শতাংশ নম্বর পায় আয়াতুল্লা। ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়ই আল-আমীনের নাম প্রথম শোনে সে। ক্লাস এইটে পড়াকালে মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় পাস করেও ভর্তি হতে পারেনি। কিন্তু মাধ্যমিকের পর ইলেভেনে ভর্তি করতে তার আব্বা-মা উঠে পড়ে লাগেন। সেইমতো মিশনের বর্ধমান শাখায় ভর্তি হয় আয়াতুল্লা। মিশনে আসার আগে সেভাবে না ভাবলেও হস্টেলে শুয়ে শুয়ে সহপাঠীদের দেখে সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পরের বছর তার টিবি ধরা পড়ে এবং দীর্ঘ প্রায় ছয়-সাত মাস তাকে ওষুধ খেতে হয়। ওই ওষুধ খাওয়ার ফলে নানারকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে অলসতা দেখা দেয়। ফলে ২০১৮-য় উচ্চ-মাধ্যমিকে সে মাত্র ৭৮.৮ শতাংশ নম্বর পায়। এতেও আয়াতুল্লা কিন্তু ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ছাড়েনি। প্রথম বছর খলতপুর শাখায় নিটের কোচিং নিয়ে খুব একটা ভালো ফল করতে না পারলেও পরের বছর খলিশানি শাখা থেকে ৫৪৫ নম্বর পেয়েও স্বপ্নপূরণ থেকে একটু দূরেই থমকে যায়। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার সময় দৌড় ও হাই জাম্পে বহু বারই পুরস্কৃত আয়াতুল্লা এ-বছর নিটের ফলে বিশাল জাম্প লাগিয়ে খলিশানি শাখা থেকেই গত বছরের চেয়ে ১০০ নম্বর বেশি, অর্থাৎ ৬৪৫ নম্বর পেয়ে আব্বা-মা ও পাড়াপ্রতিবেশীর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে সফল হয়। উল্লেখ্য, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময় মিশনে তার ফি ছিল মাত্র এক হাজার টাকা এবং নিটের কোচিঙে শেষ বছর সেটি বেড়ে হয় মাত্র তিন হাজার টাকা। এই অর্থও খুব কষ্ট করে বহন করতে হয়েছে আবুল মাজেন ও সাহানাজ বিবিকে। তাঁদের ছেলে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হবে জেনে অতীতের সব সংগ্রাম ও দুঃখ ভুলে এখন শুধু ডাক্তারবাবুর আব্বা-মা হওয়ার অপেক্ষায় তাঁরা। হাই স্কুলের ফার্স্ট বয় আয়াতুল্লা মিশনে এসে তার সহপাঠীদের পড়ার মাত্রা দেখে বুঝতে পারে, এখানকার পড়াশোনা এবং মাধ্যমিকে তার পড়াশোনার গুণগত মান ও পরিমাপের মধ্যে আশমান ও জমিন ফারাক। আয়াতুল্লার মতে, পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই এবং পরিশ্রম ও একাগ্রতাই সাফল্যের পথ। সঙ্গো আছে মিশনের হস্টেলে পড়াশোনার নিরুপদ্রব পরিবেশ, সুপারিনটেনডেন্টের সার্বিক সুপারভিশন। এ ছাড়াও মাঝেমধ্যে সেক্রেটারি স্যারের প্রজ্ঞাময় অনন্য বক্তব্য, যা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ হওয়ার জন্য অতুলনীয় মহৌষধ।

অভীক রোশন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫০৯২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৩৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

"মিশনের সেক্রেটারি স্যারের কথা শোনার আগে ভাবতাম— পারব না। কিন্তু স্যারের বক্তব্যে দাদা-দিদিদের সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা শুনে প্রতিজ্ঞা করি— আমিও পারব।" এ-কথা মুর্শিদাবাদের অভীক রোশনের। ডোমকল থানার ফতেপুর গ্রামের সন্তান অভীক। স্নাতক আহম্মেদ সালাহউদ্দিন এবং মাধ্যমিক-পাস আলিয়া ফেরদৌসী ছোটো থেকেই অভীক এবং তার দাদার শিক্ষা নিয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। নিজেদের বিঘে চারেক জমির চাষাবাদই যদিও তাঁদের আয়ের একমাত্র উৎস। তাঁদের বড়োসন্তান কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠরত।

অভীক পঞ্চম শ্রেণিতেই আল-আমীনের ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে। ছোটো বলেই তার আব্বা-মা ভর্তি করাননি। তবে তাঁরা চেয়েছিলেন মাধ্যমিক দেওয়ার পর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হোক অভীক। অভীক ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে ৮৭.৪৩ শতাংশ নম্বর পায়। একাদশ শ্রেণির মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে অভীক তার আব্বা-মায়ের আশা কিন্তু সফল করে। মিশনের উলুবেড়িয়া শাখা থেকে ২০১৯-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৪.৪ শতাংশ। এরপর শুরু হয় তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো সংগ্রাম, অর্থাৎ নিটে সাফল্যের লড়াই। আল-আমীনের ব্যবস্থাপনায় নিউটাউন হস্টেলে থেকে এক বছর কোচিং নিয়ে ৫৬০ নম্বর পায় সে। এম.বি.বি.এস.-এ সুযোগ না পেলেও বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়ে যায়। কলকাতার আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তিও হয়। এতে অভীকের স্বস্তি না-হওয়ায় আরও এক বছর নিটের কোচিং নেয় মিশনের গোলাবাড়ি শাখায়। প্রগাঢ় পরিশ্রম ও নিজের ইচ্ছেশক্তি এবং হস্টেলের গ্রুপ-স্টাডি, সব মিলিয়ে এ-বছর নিটে অভীকের প্রাপ্ত নম্বর ৬৪৪। অভীক রোশনের এম.বি.বি.এস.-এ পড়ার সুখবর শুনে ফতেপুরের বাড়ি ও এলাকায় খুশির রোশনাই জ্বলে ওঠে। তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতি অভীকের টিপস হল, প্রথমে যেকোনো বিষয়ের মৌলিক বিষয়গুলি নিজের কাছে পরিষ্কার করা এবং পরে সেসবের ধারাবাহিক সীমাহীন অনুশীলন। উল্লেখ্য, একাদশ শ্রেণিতে অভীকের মাসিক ফি ছিল দেড় হাজার টাকারও কম এবং নিট-কোচিঙের দ্বিতীয় বছরে সেটি বেড়ে হয় ২০৯০ টাকা। অভাবী-মেধাবী তরুণদের মেধা বিকাশে আল-আমীনের ভূমিকা চিরদিন মনে রাখবার মতো।

আরমান মোল্লা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫১৩৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৪২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

ডা. দেবীপ্রসাদ শেঠির নাম আমরা সকলেই জানি। তিনি একজন প্রখ্যাত ভারতীয় কার্ডিয়াক সার্জন। আরমান মোল্লার কাছে তিনিই বর্তমান ভারতের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। এর অন্যতম কারণ আরমানও ভবিষ্যতে একজন নামকরা কার্ডিয়োলজিস্ট হতে আগ্রহী। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার বেলডাঙা গ্রামের মাধ্যমিক-পাস ইনানউল্লাহ্ ও নিরক্ষর দেল আফরোজা বিবির ছোটোছেলে আরমান শৈশব

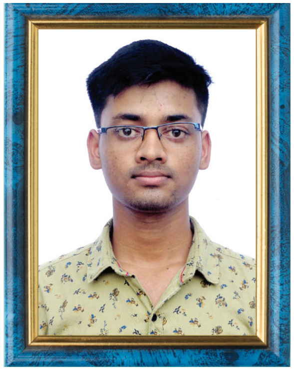

থেকে অতুলনীয় মেধাবী। গ্রামের আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের অসংখ্য মেধাবীর মতো আরমানের মেধার অকালপতন হতে পারত। কিন্তু সেটি হয়নি।

আরমান গ্রামের স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। তাদের এলাকার মিশনের দু-জন প্রাক্তনী বর্তমানে শিক্ষকতা করেন। এঁদের মধ্যে এক জন আরমানের টিউটর। তাঁর চেষ্টায় আরমান মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় পাস করে বীরভূম জেলায় মিশনের পাপুড়ি শাখায় ভর্তি হয়। সে-সময় তার মাসিক ফি ছিল ৫৯০ টাকা। ২০১৮ সালে সেই শাখা থেকে আরমান ৮৯.৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। একাদশ শ্রেণিতে আরমানের স্থান হয় মেমারি শাখায়। ২০২০-তে এখান থেকেই ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। নিম্নবিত্ত পরিবারের আরমানের আব্বা একটু ভালো রোজগারের আশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতে মুম্বাই গিয়েছিলেন। কিন্তু বেশি দিন সেটি করতে পারেননি। হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে চিকিৎসাধীন তিনি বর্তমানে নিজেদের জমিতেই কৃষিকাজ করে কষ্টেসৃষ্টে সংসার নির্বাহ করেন। স্নাতক প্রথম বর্ষে পাঠরত আরমানের দিদি ও নবম শ্রেণিতে পাঠরত বোনের শিক্ষার খরচ ও সংসারের খরচ নিয়ে নাজেহাল অবস্থা তাঁদের। আরমানের চাচা ও মামারা তাঁদের কিছুটা হলেও সহায়তা করে চলেছেন। একাদশ শ্রেণিতে আরমানের মাসিক ফি ছিল ১৩৪০ টাকা। কিন্তু চার মাস পর সরকারি বৃত্তিপ্রকল্পের আওতায় আরমানকে এনে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পর্যন্ত বিনা ফিতেই তার পড়াশোনার বন্দোবস্ত করেছে মিশন কর্তৃপক্ষ।

প্রথম থেকেই আরমানের সুপ্ত ইচ্ছে ছিল চিকিৎসক হওয়ার। সেই সূত্রেই উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বর্ষেই নিটে ৪৭৩ নম্বর পেয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সাঁতরাগাছি ক্যাম্পাসে খন্দকার মহিউল হকের তদারকিতে নিটের জন্য এক বছর চলে নিবিড় ক্লাস ও মক-টেস্ট। ফলও হয় সেরকম, ৪৭৩ নম্বর থেকে এক ধাক্কায় ৬৪৪ নম্বরে পৌঁছে মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় এম.বি.বি.এস.-এ নিজের সিট পাকা করে ফেলা। অসুস্থ আব্বা, মা ও আত্মীয়স্বজনদের পাশাপাশি গোটা এলাকাজুড়ে নারী-পুরুষের দোওয়া ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়া। কোচিংপর্বেও আরমানের মাসিক ফি ছিল ২০৯০ টাকা। মিশন, মিশনের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকদের প্রতি কৃতজ্ঞ আরমান মিশনের সেক্রেটারি স্যার সম্পর্কে বলে, “স্যারের বক্তব্যের পরে পরেই আমরা সকলেই উজ্জীবিত হয়ে পড়তাম। বহুদিন পর্যন্ত সূক্ষ্মভাবে থাকত এই রেশ।” উল্লেখ্য, বড়ঞা ব্লকের কল্যাণপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে আরমান মোল্লাই এম.বি.বি.এস. পড়তে সুযোগ পাওয়া প্রথম ছাত্র।

আবু আল সোহেল রানা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫১৫৪, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৪৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

পিতা সোহবার মণ্ডল একজন কৃষক, পড়াশোনা ক্লাস এইট পর্যন্ত। মাধ্যমিক-পাস পারুলা বিবি সংসারধর্মই পালন করেন। এম.এ.-পাস একমাত্র দিদি। এম.বি.বি.এস.-এ প্রথম বর্ষের পড়ুয়া আবু আল সোহেল রানার এটাই পরিবার। গ্রামবাংলার, বিশেষত প্রান্তিক সমাজে এরকম অসংখ্য গ্রাম আছে, যেখানে এখনও সে-গ্রামের একজনও কোনো মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার বঘারপুর রমণা সেরকম

একটি গ্রাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেখানে আল-আমীনের দৌলতে সোহেল রানার মাধ্যমে সেই শূন্য একে পৌঁছেছে। শুধু সেই গ্রামের প্রথম নয়, বরং গঙ্গাদাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেও প্রথম এম.বি.বি.এস.-পড়া কৃষকসন্তান সোহেল রানা।

ডোমকলের এক আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২০১৮ সালে মাধ্যমিকে ৯০ শতাংশ নম্বর-প্রাপ্তি দিয়ে যাত্রা শুরু সোহেলের। পরের গন্তব্য আল-আমীনের মেমারি ক্যাম্পাস। কারণ, পুরোনো স্কুলের উচ্চ-মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে সোহেলের মন চায়নি। মিশনের মেমারি শাখা থেকেই ২০২০-তে উচ্চ-মাধ্যমিকে সে ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর পায়। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির পর সোহেল কিন্তু ডাক্তার হওয়ার লক্ষ স্থির করেনি। কারণ, জীববিদ্যা বিষয়ে সেরকম আগ্রহ ছিল না তার। দ্বাদশ শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায় মেমারি শাখায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সোহেল দেখে তার চেয়ে কম নম্বর পাওয়া সহপাঠীরাও নিটে বসতে মনস্থির করছে। তখনই সোহেল সিদ্ধান্ত নেয়, সেও রানিং ইয়ারে নিটে বসবে। এ ছাড়া মেমারি শাখায় অনুষ্ঠিত এক সভায় সেক্রেটারি স্যারের কথাও তার স্মরণে আসে। স্যার বলেছিলেন, "তোমরা মিশনের মাঠে শুধু নোংরা কাদাই দেখছ। আর আমি দেখছি মিশনের অসংখ্য সফল ছাত্র-ছাত্রীদের, যারা সকলেই কষ্ট করে সাফল্য পেয়েছে।" নিটে ৫০৩ নম্বর পেয়ে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত হয়ে ওঠে সোহেল। পরের বছর নয়াবাজ ক্যাম্পাসে নিটের কোচিং নিয়ে ৬৪৪ নম্বর পেয়ে মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে সে। মাধ্যমিক পর্যন্ত দুরন্ত ক্রিকেট, ফুটবল ও ভলিবল খেলা সোহেল একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ার চাপে সেভাবে খেলার মাঠে নামেনি। বিশেষ করে নিট প্রস্তুতির জন্য শেষদিকে দিনে গড়ে ১২-১৩ ঘণ্টা অনুশীলনে মগ্ন থাকত। সোহেল মনে করে মিশনে পড়ার পরিবেশকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারা এবং নিট প্রস্তুতির নিজ নিজ পরিকল্পিত পরিশ্রমই সাফল্যের মূল কারণ। ক্লাসটেস্ট বা মকটেস্টে কম নম্বর পেয়ে ডিপ্রেশনে ভোগা যাবে না। কারণ, সেই টেস্টের ভুলগুলোকে অনুশীলনের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে পারলে পরের বার ভালো ফল হতে বাধ্য। নয়াবাজের ইন-চার্জ খন্দকার মহিউল হকের ব্যবস্থাপনা ও সুপারভিশনে সোহেল মুগ্ধ। পড়াশোনাসহ আবাসিকদের সমস্ত সমস্যা খুব ধৈর্য ধরে শোনা ও সমাধান করতে তিনি দক্ষ। এ ছাড়াও পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য গাইড করতে ও সাহস জোগাতে সবসময় হাসিমুখে তিনি হাজির থাকেন। একাদশ শ্রেণিতে সোহেলের ফি ছিল মাসে ২৩৪০ টাকা এবং নিটের কোচিঙে সেটি হয় ২৮৪০ টাকা। অভাবী-মেধাবীদের জন্য মিশনের আর্থিক সুবিধা পায় সে। মিশনের হস্টেল থেকে মেডিকেল কলেজের হস্টেলে ফিরে এসেছে সোহেল তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রথম পাস-করা ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে।

সোয়েব আখতার খান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫১৮৬, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৪৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মাধ্যমিক-পাস সইদুল খান গ্রামীণ চিকিৎসক। চিকিৎসক পরিমণ্ডলে থাকার সূত্রে অনেক বড়ো বড়ো চিকিৎসকদের দেখতেন, আর মনে মনে স্বপ্ন দেখতেন নিজের সন্তানকে বড়ো ডাক্তার করার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল থানার কাঞ্চনপুর গ্রামের সইদুল খানের

সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তাঁর পুত্র সোয়েব আখতার খান ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৫১৮৬ র‍্যাঙ্ক করে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। সইদুল খানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে সহযোগিতা করেছে আল-আমীন মিশন।

সইদুল খানের দুই পুত্র ও এক কন্যাসন্তান। বড়োছেলে সামিম আখতার খান বি.এ. পাস। ছোটোমেয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তিন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সোয়েব আখতার খান। সোয়েব গ্রামের স্কুলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। ২০১৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে ৮৮ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে পাস করে। এরপর আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। আল-আমীন মিশনের খড়্গাপুর শাখায় বর্তমানে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা হয়। সোয়েব যখন ভর্তি হয় তখন সেখানে বাংলা মাধ্যমেই পঠন-পাঠন চলত। সোয়েব ভর্তি হওয়ার পরের বছর থেকে ইংরেজি মাধ্যম শুরু হলে, খলিশানি শাখায় চলে আসতে হয় তাকে। ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮২.৬ শতাংশ নম্বর পায়। এরপর নয়াবাজ শাখায় নিট পরীক্ষার কোচিং নেয়। ২০১৯ সালে ৪৫৫৯১ র‍্যাঙ্ক হয়। সরকারি কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ না পাওয়ায় বি.ডি.এস. কোর্সে ভর্তি হয়। ভর্তি হয় বটে কিন্তু এম.বি.বি.এস. পড়ার লক্ষ্যে আবার পরের বছর নিটে বসে। র‍্যাঙ্ক আরও পিছোয়, বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগই আসে। অবশেষে তৃতীয় বারের চেষ্টায় ২০২১ সালের নিটে সোয়েব আখতার খানের সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ৫১৮৬। দীর্ঘ লড়াই-শেষে সোয়েব পিতার স্বপ্নের সঙ্গে নিজের স্বপ্নও সফল করতে সক্ষম হয়।

গ্রামে থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে হলে বিভিন্ন জায়গায় টিউশনি পড়তে যাওয়া, ভালো শিক্ষক পাওয়ার অভাবের কথা ভেবে আল-আমীন মিশনে এসেছিল সোয়েব। তবে আল-আমীনে এসে সোয়েবের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে পড়াশোনার পরিবেশ। এসব পাওয়ার সঙ্গে আল-আমীন মিশন সোয়েবকে আর্থিক ছাড় নিয়ে পড়াশোনার সুযোগও দিয়েছে। প্রায় অর্ধেক ছাড়ে পড়েছে সে। ভালো র‍্যাঙ্ক করতে এতদিন লাগল কেন? এই প্রশ্নে সোয়েব জানায়, কিছু ভুল ছিল সেগুলো কাটাতে সময় লেগেছে। অনেকের মতো সূত্র মুখস্থ করে পড়তে গিয়ে ভুল করেছে সে। তাই পরামর্শ দিয়েছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার। প্রথম থেকে এনসিইআরটির বই পড়া আর মকটেস্টের ওপর জোর দেওয়া জরুরি বলে মনে করে সোয়েব।

সেক নাদিম আলি

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫২৯০, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৫৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

উচ্চ-মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের বোর্ড-পরীক্ষা এবং একইসঙ্গে মেডিকেলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বহু ছাত্র-ছাত্রী বসলেও খুব কম সংখ্যক পরীক্ষার্থীই দ্বিতীয়টিতে সফল হয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের কাছাকাছি চনশ্বরপুর গ্রামের রাজমিস্ত্রি সেক কাসেদ আলির সন্তান সেক নাদিম আলি সেই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছে। সেক কাসেদ আলির পড়াশোনা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন তাঁর স্ত্রী নাসিমআরা বিবি। কৃষিজমিহীন এই পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস রাজমিস্ত্রিগিরি। এই সামান্য অনিয়মিত আয়

দিয়েই ইতোমধ্যেই নাদিমের তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁরা তিন জন যথাক্রমে নবম শ্রেণি, গ্র্যাজুয়েট ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

স্থানীয় স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর নাদিম মিশনের মেদিনীপুর শাখায় ভর্তি হয়। আর্থিকভাবে দুর্বল এই পরিবারের সন্তানের শিক্ষায় মিশন কর্তৃপক্ষ বেশ ভালোরকম ছাড় দিয়ে মাসিক ১৫৯০ টাকায় তাকে ভর্তি নেয়। নাদিম মেদিনীপুর শাখা থেকে ২০১৯ সালে মাধ্যমিকে ৯৩.১৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। একাদশ শ্রেণিতে নাদিমের পড়াশোনা মিশনের পাঁচুড় শাখায়। হস্টেলে অসংখ্য মেধাবী পড়ুয়ার সঙ্গ পেয়ে নাদিমের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব জেগে ওঠে এবং ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-ম্যাথমেটিক্স-বায়োলজির অসংখ্য সমস্যা সমাধানে বাড়তে থাকে উৎসাহ। একাদশ শ্রেণি থেকে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাসের সঙ্গে নিট প্রস্তুতির যৌথ পড়াশোনা মিশনে আবাসিক শিক্ষাঙ্গনের এক বড়ো পাওনা। নাদিম এখান থেকেই ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯৫.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে নিজের মেধার প্রতি সুবিচার করে। সঙ্গে ২০২১-এর নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৪৩ নম্বর পেয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

নাদিমের মতে, সংখ্যালঘু সমাজের সর্বস্তরে পড়াশোনার সুষম পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি। এ ছাড়া বিশেষ করে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য যে-টিউশন লাগে, গ্রামীণ এলাকায় সেটির বড়োই অভাব। সে-ক্ষেত্রে মিশনের আবাসিক শিক্ষালয়ে পড়ার পরিবেশ অনেক উন্নত ও সুসংগঠিত। এখানে কোনো বিষয়ে কিছু বুঝতে বা সমাধান করতে না পারলে শিক্ষক ছাড়াও সিনিয়র দাদাদের সহযোগিতা এক বড়ো পাথেয়। এ ছাড়াও আছেন প্রত্যেক শাখার সুপারিনটেনডেন্ট। যেমন পাঁচুড়ের মহম্মদ সাব্বির সরকার। আবাসিক ছাত্রদের জন্য সর্বক্ষণ যেকোনো প্রয়োজনে তাঁর উপস্থিত থাকা এবং অ্যাকাডেমিক্যালি অবিরাম উৎসাহ প্রদান করাও বড়ো বিষয় বলে জানায় নাদিম। উল্লেখ্য, রানিং বর্ষে পাঁচুড় শাখা থেকে নাদিম বাদে আরও দু-জন নিটে সফল হয়েছে।

মির্জা আব্বাস

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫৪৪৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৫৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

আল-আমীনের সফল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যতই ছড়িয়ে পড়ছে সংখ্যালঘু সমাজে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ ততই বাড়ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত রাজ্যের যেসব প্রান্তিক এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির নাম পর্যন্ত শোনা যেত না, মিশনের প্রাক্তনীদের দৌলতে এখন সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরাও মিশনের শিক্ষা-আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার বর্ধনপুর গ্রামের মির্জা আব্বাস ছোটোবেলা থেকেই মিশনের নাম শুনেছে। শুধুই নাম শোনা নয়, মিশনে ভর্তি হতেও ছোটো থেকেই ছিল উদ্গ্রীব। এর অন্যতম কারণ তার মামা মিশনে পড়ে চিকিৎসক হয়েছেন। আব্বাস অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য মিশনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হয়েছিল। ছোটো বলে তার আব্বা-মা ভর্তি করেননি, কিন্তু মনস্থির করে রেখেছিলেন তাঁদের আব্বাস মাধ্যমিকের পর মিশনে

পড়বে।

আব্বাস চক ইসলামপুরের এক স্কুল থেকে ২০১৭ সালে ৮৬.৮৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করে। পূর্বপরিকল্পনামতো একাদশ শ্রেণিতে আব্বাস মিশনে ভর্তি হয়। মিশনের পাঁচুড় শাখায় তার পড়াশোনা আরম্ভ করে। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় এখান থেকেই ২০১৯ সালে ৯২.২ শতাংশ নম্বর পায়। এরপর শুরু হয় মামার পদাঙ্ক অনুসরণ, অর্থাৎ ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্যে কোচিং। ২০২০ সালে নিটে বেশ ভালো নম্বর, ৫৫১ পেলেও এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ না পেয়ে আব্বাস কষ্ট পেয়েছিল। দুঃখ পেলেও বিমর্ষ হয়ে পড়েনি। নতুন উদ্যম ও উৎসাহে বেশি বেশি পড়াশোনা এবং বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত করে নিজেকে। ফলস্বরূপ এ-বছর গতবারের চেয়ে ৯১ নম্বর বাড়িয়ে মোট পেয়েছে ৬৪২ নম্বর। আব্বাসের মতে বাড়ির পরিবেশে পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। মিশনের হস্টেলে পাওয়া যায় সে তুলনায় অনন্য আদর্শ পড়ার পরিবেশ। এখানে চারিদিকে সবাই পড়ছে। এটা দেখেই একজন পড়ুয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবেই পড়তে লেগে যায়। সঙ্গে আছে গ্রুপ-স্টাডি এবং সবসময় আবাসিক শিক্ষকের সহায়তা। এই ব্যবস্থায় একজন পরীক্ষার্থী হয়ে ওঠে দারুণ প্রত্যয়ী। জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তার পরামর্শ— মনে কোনো সময় আনা যাবে না 'আমি পারব না' মনোভাব। সবসময় মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে অঙ্গীকার করতে হবে— আমি পারবই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন আব্বাসের আব্বা আব্দুল হাই। মা তহমিনা খাতুন উচ্চ-মাধ্যমিক-পাস। দাদা ইংরেজিতে এম.এ. করছেন এবং বোন এ-বছরের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। একাদশ শ্রেণিতে মাসিক ফি ছিল ৫৩০০ টাকা এবং নিটের কোচিং পূর্ণ-বেতনেই পড়েছে আব্বাস। তার সাফল্যে মিশনের অবদান নিয়ে উচ্ছ্বসিত সে জানায়, নিটে ভর্তির সময় সেক্রেটারি স্যার বলেছিলেন— আব্বাস মির্জা ডাক্তার হবেই।

রুবেল মোল্লা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৫৪৫৭, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৬০

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

এশিয়ায় পশ্চিমি চিকিৎসা শেখানোর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মেডিকেল কলেজ ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই মেডিকেল কলেজ, কলকাতা, যার পুরো নাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, কলকাতা। এই প্রতিষ্ঠানে ২০২১-'২২ শিক্ষাবর্ষে এম.বি.বি.এস. কোর্সে আল-আমীনের ৩১ জন ছাত্র ও ৪ জন

ছাত্রী-সহ মোট ৩৫ জন ভর্তি হয়েছে। ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩৪ জন আবাসিক, একজন অনাবাসিক। উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বরূপনগর থাক্ষ্মনার হাকিমপুরের বাসিন্দা রুবেল মোল্লাও আছে এই ৩৭ জনের মধ্যে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়া রুবেলের আব্বা রকিব মোল্লা

ছোটো এক মুদি-দোকান চালান। তাতেও সংসার নির্বাহ হয় না, ফলে মাঝেমধ্যে অন্যের জমিতে কৃষিকাজও করতে হয়। সপ্তম মান রুবেলের মা গৃহবধূ এবং স্নাতক দাদা টিউশন করেন। এই পরিবারের মেধাবী রুবেল ক্লাস ফাইভ থেকে স্বপ্ন দেখত আল-আমীনে পড়ার। রুবেলের স্বপ্ন সফল হয় মাধ্যমিক দেওয়ার পর। হাকিমপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১ শতাংশ নম্বর নিয়ে পাস করে। এরপর মামাদের আর্থিক সহায়তায় রুবেল মিশনের সূর্যপুর শাখায় ভর্তি হয়। যদিও মিশনের তরফে বড়ো রকমের ছাড় দিয়ে তার মাসিক ফি নির্ধারিত হয় ৩০০০ টাকা। এই শাখা থেকেই ২০১৯ সালে ৯৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে সে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। ওই বছর নিটে বসলেও আশানুরূপ ফল হয়নি তার।

রুবেল কিন্তু দমে যাওয়ার পাত্র নয়। নিটের কোচিং নেওয়ার জন্য সে মিশনের পাঁচুড় শাখায় ভর্তি হয়। সেখানে এক বছর কোচিঙে নিবিড় অনুশীলন করে। ২০২০ সালে ৫৩০ নম্বর পায়। একটু আশাহত হয় রুবেল। কারণ, ওই নম্বরে এম.বি.বি.এস. পড়ার ছাড়পত্র হাতে আসেনি। আব্বা-মা এবং মামাদের উৎসাহে রুবেল পরের বছর নিজের নিট প্রস্তুতিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস ও মকটেস্টগুলিতে খুব জোর দেয়। সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট মহম্মদ সাব্বির সরকার রুবেল-সহ সমস্ত রিপিটারদের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিট প্রস্তুতির ব্যবস্থা করেন। নিজের পরিশ্রম ও গ্রুপ-স্টাডির নিবিড় অধ্যয়নে ২০২১-এর নিটে গত বছরের চেয়ে ১১২ নম্বর বেশি পেয়ে ৬৪২-এ পৌঁছে যায় রুবেল। এইভাবে আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে এম.বি.বি.এস. পড়ার যোগ্য হয়ে ওঠে সে। রুবেলের সাফল্যে তার এলাকার অভিভাবকদের মধ্যে মিশনে পড়ানোর আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। রুবেলের মতে গ্রামীণ প্রান্তিক, বিশেষত সংখ্যালঘু সমাজে বিজ্ঞানশিক্ষার পরিবেশ এখনও সীমিত। মিশনের কল্যাণে সেটি ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হচ্ছে, এটাই আশার কথা।

উজ্জ্বল সেখ

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬২১৬ , রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৯২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা থানার বটুকনাথপুর গ্রামের সেন্টু সেখ পড়াশোনা জানেন না। দিনমজুরি করে সংসার চালান। তাঁর স্ত্রী উজিলা বিবি একটু বেশি পড়াশোনা জানেন—অষ্টম পাস। তাঁদের দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়ে সবার ছোটো। সে ক্লাস এইটে পড়ছে। ছোটোছেলে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর পড়া ছেড়ে দিয়ে গাড়ি চালানো শিখেছে। গাড়ি চালিয়ে ছোটোছেলের উপার্জিত অর্থ আর নিজের দিনমজুরির অর্থ একত্রিত করে সংসার চালানোর পর যা থাকে, তা বড়োছেলের পড়াশোনার জন্য ব্যয় করেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জিত অর্থ দিয়ে ছেলেকে মানুষ করার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। দিনমজুর সেন্টু সেখের বড়োছেলে উজ্জ্বল সেখ এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। পড়াশোনার প্রতি ভালোবাসা একটা গোটা পরিবারকে কেমন সম্ভাবনাময় আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের সামনে উপস্থিত করে, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেন্টু সেখের পরিবার।

উজ্জ্বল সেখ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে গ্রামের স্কুলেই। মাধ্যমিকের পর, আল-আমীন মিশনের ভর্তির পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে দেখে অন্য একটি আবাসিক মিশনে ভর্তি হয়। ২০১৭ সালে মাধ্যমিকে ৮৪.৪ শতাংশ নম্বর পাওয়া উজ্জ্বল ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৬.৪ শতাংশ নম্বর। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন পূরণ করা কঠিন ভেবে নিট কোচিং নিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়। প্রথম বছর খলিশানি শাখায়, পরের বছর সাঁতরাগাছি শাখায় নিট-কোচিং নেয়। প্রথম বার, ২০২০ সালে তার নিট র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৯১ হাজারের মতো। দ্বিতীয় বার, ২০২১ সালে তার সর্বভারতীয় নিট র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৬২১৬। লকডাউন থাকায় কোচিং নিতে সমস্যার মুখে পড়তে হলেও, অনলাইন পড়াশোনা আর সেল্ফ-স্টাডিতে জোর দেওয়াতেই এমন চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছে সে। উজ্জ্বল সেখের পিতা সেন্টু সেখ ও তাঁর পরিবার একটা উজ্জ্বল নজির রেখেছেন সকলের সামনে। তাঁরা কষ্ট করে হলেও নিজের সন্তানকে প্রায় সম্পূর্ণ বেতন দিয়েই পড়িয়েছেন। শুধু আল-আমীন মিশনে নয়, আগে যে-মিশনে পড়ত, সেখানেও প্রায় পূর্ণ-বেতনে পড়েছে। তাঁরা নিজেদের অভাবের কথা কোথাও বলেননি। দিনমজুর সেন্টু সেখ যে মানসিকভাবে সমৃদ্ধশালী তার প্রমাণ রেখেছেন। পিতা ও ছোটোভাইয়ের কষ্টার্জিত অর্থে পড়ে মর্যাদার সঙ্গে নতুন দিনের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছে উজ্জ্বল সেখ।

রাজ মল্লিক

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৫৩৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২০৮

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার বারিশালি গ্রামের বাসিন্দা মন্টু মল্লিক। টেনে-হিঁচড়ে নিজের নামটুকুই সই করতে পারেন। মাত্র

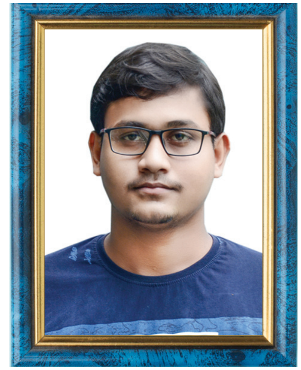

কয়েক কাঠা জমিতে দিনরাত এক করেও যা উপার্জন হয়, তাতে পাঁচ-ছয় জনের সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সংসার চালাতে অপরের বড়িতেও করেন কায়িক শ্রমের কাজ। স্ত্রী রুপালি বেগমও পাশে থেকে তাঁর স্বামীকে যথাসম্ভব সহায়তা করেন। তাঁদেরই সন্তান রাজ। পড়াশোনায় মেধাবী। গ্রামেরই হাই স্কুল থেকে ২০১৭-য় মাধ্যমিকে প্রায় ৯৩ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। ভালো রেজাল্ট করে তার জেদ চাপে আল-আমীনে পড়ার, কারণ, সে শুনেছে, সেখানে পড়লে চিকিৎসক হওয়া যায়। মিশনে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসও করে। পাসের খবরে তার আব্বা-মা খুশি হলেও পড়াশোনার খরচ নিয়ে চিন্তায় পড়েন। কিন্তু রাজ এ-বিষয়ে খুব নিশ্চিত ছিল যে, প্রবেশিকা পরীক্ষা তার খুব ভালো হয়েছে। সে বন্ধুদের কাছে শুনেছে মিশন মেধাবী ছাত্রকে ফেরায় না। শেষমেষ একেবারে মিনিমাম ফিতে রাজ সত্যি সত্যিই খলতপুর শাখায় ভর্তি হয়। ২০১৯-এ মিশনের খলতপুর শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯১ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে সে পাস করে। চিকিৎসক হওয়ার মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল, এবারে শুরু করে আসল লড়াই, অর্থাৎ নিটে সাফল্যের জন্য দিনরাত এক করে দেওয়া। রানিং ইয়ার এবং তার পরের বছরও নিটে ভালো র‍্যাঙ্ক হয়নি। পর পর দু-বার ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র না পেলেও হাল ছাড়বার পাত্র নয় রাজ। আব্বা-মায়ের কষ্টের মুখখানি আপসেই চোখের সামনে আসলে তার চোখ আর্দ্র হয়ে যেত। পরক্ষণেই

চোয়াল শক্ত করে আবার ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-বায়োলজির সমুদ্রে গভীর ডুব দিত। ভালো করেই অনুভব করত যে, নিটের ১৮০-টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার মধ্যেই আছে তার আব্বা-মায়ের মুখে হাসি ফোটানো। এ-বছর ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৩৭ নম্বর পেয়ে রাজ সর্বভারতীয় স্তরে র‍্যাঙ্ক করে ৬৫৩৮। দাদু, দিদা, আব্বা-মা, ভাই এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল রাজ সত্যি সত্যি রাজা হয়ে গেছে।

রাজ এখন এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের ছাত্র। ২০১৭-য় মন্টু মল্লিক রাজকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আর্জি নিয়ে খলতপুরে এসেছিলেন। ডাক্তারি-পড়া ছেলের বইপত্র কেনা ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য স্কলারশিপের আবেদন নিয়ে পুনরায় পাঁচ বছর পর সম্প্রতি আবার খলতপুরে আসেন। সে-বারের মতো এ-বারেও মিশন তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে স্কলারশিপ অনুমোদন করেছে। আসুন, শুনে নিই রাজের কথা— "মিশন আমাকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে এবং কীভাবে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হয়, তার মন্ত্রও শিখিয়েছে। আমার পারিবারিক পরিস্থিতি কখনো আমাকে মেডিকেলে পড়ার সাহস দেয়নি, সেই সাহস দিয়েছেন আল-আমীন মিশনের সেক্রেটারি জনাব নুরুল ইসলাম স্যার। এক-কথায় আমার জীবনে মিশনের অবদান ভোলার নয়। যতদিন বেঁচে থাকব মিশনকে বুকের মাঝে রাখব।"

রাজিবুল ইসলাম সর্দার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৬৩৭, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২১৩

ইনসটিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ

"বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করলে নিট ক্র্যাক করা সম্ভব হত না। আব্বা-মা-এলাকাবাসী সবাই খুব খুশি হয়েছেন। এই সাফল্যের প্রায় পুরোটাই আল-আমীনের অবদান। আমাদের গ্রাম ও পাশের গ্রামগুলোতে এর প্রভাব পড়েছে।" এক-নাগাড়ে এই আশাবাদ জানাল নদীয়া জেলার থানারপাড়া ব্লকের শুভরাজপুর গ্রামের রাজিবুল ইসলাম সর্দার। সম্প্রতি সে জনগণে পরিচিত কলকাতার পি জি হাসপাতালে এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, পি জি হাসপাতালেরই প্রকৃত নাম ইনসটিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ।

অষ্টম মান আব্দুর রাজ্জাক সর্দার নিজেদের বিঘে তিনেক জমিতে মুখ্যত সবজিচাষ করে সংসার নির্বাহ করেন। স্বামীর লড়াইয়ে যোগ্য সঙ্গ দেন মাধ্যমিক-পাস নাজিয়া খাতুন বিবি। এত কঠিন কষ্টের সংসারেও তাঁরা উভয়েই তাঁদের দুই সন্তানের উপযুক্ত শিক্ষা বিষয়ে প্রথম থেকেই দারুণ সচেতন। তাঁদের বাড়ির বড়োছেলে সম্প্রতি কম্পিউটার সায়েন্সে বি.টেক. পাস করেছে। ছোটোছেলে রাজিবুল হাই স্কুলে পড়ার সময়েই আল-আমীন মিশনের নাম জানতে পারে। তার মামা মিশনের প্রাক্তনী, যিনি বর্তমানে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পি.এইচডি. করছেন। স্থানীয় স্কুলে এইট পর্যন্ত পড়ার পর রাজিবুলের সুযোগ আসে নবম শ্রেণিতে মিশনে পড়ার। আর্থিকভাবে দুর্বল রাজিবুলের আব্বার আবেদনে সাড়া দিয়ে মিশন কর্তৃপক্ষ মাসিক ১৪৩০ টাকা তার মাসিক ফি ধার্য করে। শুরু হয় রাজিবুলের মিশনজীবন। ২০১৬ সালে ৯০.৫৭ শতাংশ নম্বর পায়

মাধ্যমিক পরীক্ষায়। বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে রাজিবুলের স্থান হয় মিশনের ভাঙড় শাখায়। ২০১৮ সালে ৯১.৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে।

উচ্চ-মাধ্যমিকের পর মিশনে রাজিবুলের দ্বিতীয় লড়াই শুরু। অর্থাৎ, এ-বারে মূল লক্ষ্য নিট ক্র্যাক করা। আবার শাখা বদল হয় তার। নিটের কোচিং নিতে তাকে খলিশানি শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে একদিকে চলে শিক্ষকদের ক্লাস ও অন্য দিকে নিজেদের অনুশীলন। প্রথম বার ২০১৯-এ সে নিটে পায় ৪৩৩ নম্বর। পরের বারের জন্য শুরু করে জোরকদমে সংগ্রাম। এ-বারে তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৬৬। এম.বি.বি.এস. পড়ার জন্য এই নম্বর কাছাকাছি হলেও মাত্র কয়েক কদম দূরে এসে আটকে যায়। রাজিবুল বি.ডি.এস.-এ ভর্তি হয়েও আরও একবার নিজেকে উজাড় করে পড়াশোনা ও অনুশীলনে মগ্ন করে। শেষে এই অসামান্য চেষ্টা তাকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। এ-বছরের নিটে সে ৬৩৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যের নামকরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। রাজিবুল এখন প্রত্যন্ত শুভরাজপুরের গর্ব। রাজিবুল তার এই লড়াইয়ে আত্মীয়স্বজন ছাড়াও মিশনকে সব সময় পাশে পেয়েছে। খলিশানি শাখায় পড়াশোনার সুযোগ ও সুবিধার পাশাপাশি সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট সেখ আনিসুর রহমানের সার্বিক ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত বলে জানায় সে। এ ছাড়াও মিশনের ক্যাম্পাসে, বিশেষ করে উচ্চ-মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগ ও নিট-কোচিঙের জন্য জরুরি সমস্ত ধরনের বইপত্র ও অন্যান্য উপকরণ সহজলভ্য। অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সিনিয়র দাদাদের পরামর্শও পরীক্ষায় খুব সহায়ক হয়। সে মনে করে নিটে সাফল্যের জন্য ক্লাসটেস্ট ও মকটেস্টের সংখ্যা বাড়ানো অতি জরুরি।

নিশাত তাসনিম

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৭৯৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২২৪

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

২০২১ সালের নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৩৬ নম্বর পেয়ে ৬৭৯৮ র‍্যাঙ্ক করেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বাওড়িপুনি গ্রামের মেয়ে নিশাত তাসনিম। নিশাত ক্লাস সিক্স থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত পড়েছে বহরমপুরের জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে। ইংরেজি মাধ্যমের এই বিদ্যালয়ে পড়ে মাধ্যমিক স্তরে পেয়েছিল প্রায় ৯৫ শতাংশ নম্বর এবং উচ্চ-মাধ্যমিকে পেয়েছিল প্রায় ৯৩ শতাংশ নম্বর। ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পর নিট কোচিং নিতে আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল। আল-আমীন মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় আবাসিক হিসেবে ছিল এক বছর। ২০১৯ সালে কোচিং নেওয়ার আগে নিট পরীক্ষায় বসে ৭২০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিল ২০০ নম্বরের আশেপাশে। নিট-কোচিং নেওয়ার পর ২০২০ সালের নিট পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয় ৪৯১৭৫। পেয়েছিল ৫৫০ নম্বর। বি.ডি.এস. এবং স্টেট কোটায় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ার সুযোগ পেলেও ভর্তি হয়নি। আরও এক বছর পড়লে নিশ্চিত এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পাবে, আত্মবিশ্বাসী নিশাত আশ্বস্ত করে অভিভাবকদের। ২০২১-এর পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৬৭৯৮।

কথা হচ্ছিল নিশাতের পিতা মহম্মদ তাজিবুল হকের সঙ্গে। তিনি বি.এইচ.এম.এস. পাস করা চিকিৎসক। তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ নিশাতের মা মেহেবুবা পারভিন উচ্চ-মাধ্যমিক পাস, আই.সি.ডি.এস.-কর্মী। নিশাতরা দু-বোন এক ভাই। ছোটোবোন পড়ে একাদশ শ্রেণিতে, আল-আমীন মিশনের ধুলিয়ান শাখা রহমানি একাডেমিতে। ছোটোভাই জওহর নবোদয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে।

সচ্ছল পরিবারের অনেকেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি শহর-কেন্দ্রিক পেশাদার কোচিং সেন্টারের দিকে ধাবিত হয়। নিশাতকে কেন দিলেন না? সচেতন অভিভাবক তাজিবুল হকের উত্তর, "আসলে আল-আমীন মিশনের দুটো প্লাস পয়েন্ট আছে, যেটা ওইসব প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে না। এক, সুপারভিশন। শুধু কোচিং দিয়ে নিটের মতো পরীক্ষায় পাস করানো শক্ত। কোচিঙের পর ছেলে-মেয়েরা পড়ছে কতটা, তার তদারকি করা জরুরি। অন্যটি হল, পড়াশোনার পরিবেশ এবং ইসলামি কালচার।" এই কারণগুলির জন্যই ছোটোমেয়েকেও আল-আমীন মিশনে ভর্তি করেছেন তিনি।

পড়তে অত্যন্ত ভালোবাসে নিশাত। তাই অন্য ভালো লাগার কোনো বিষয় নেই নিশাতের কাছে। "এম.বি.বি.এস. পড়ার তো সুযোগ পেয়েছ। এম.বি.বি.এস.-এর পর কী করতে চাও?"— এই প্রশ্নে নিশাত জানায়, "আগে এম.বি.বি.এস. করি ভালো করে, তারপর দেখব কী করা যায়।"

রূপা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৯২৩, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২৩২

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৬৩৫ নম্বর পেয়ে ৬৯২৩ র‍্যাঙ্ক করেছে

পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট থানার গোকর্ণ গ্রামের মেয়ে রূপা খাতুন। রূপার সঙ্গে কথা বলার জন্য যে ফোন নম্বর ছিল, সেই নম্বরে ফোন করতে যিনি ফোনটা ধরলেন, তিনি সারাফত সেখ। একজন হবু ডাক্তার। শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে তিনি ইন্টার্নশিপ করছেন। আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। একই পরিবারের দু-ভাইবোন ডাক্তার হতে চলেছে, যাদের জীবনের এই অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে আল-আমীন মিশন। রূপার কথায় ফিরে আসি। রূপা আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস নাইন থেকে। খলতপুর শাখায়। ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছিল ৬০৮ নম্বর। ৮৬ শতাংশ। ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৮ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছিল। ২০১৮ সালেই নিট পরীক্ষায় বসেছিল রূপা। তারপর আরও তিন বার। চতুর্থ বারে সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছে। প্রথম বার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল পাঁচ লাখের বেশি, সেখান থেকে ৬৯২৩ র‍্যাঙ্ক এ-বার। ২০২০ সালের পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৫ হাজারের মতো।

"বার বার হচ্ছে না দেখে হতাশ লাগেনি?" প্রশ্ন শুনে রূপা জানায়, "না, সেরকম কিছু মনে হয়নি। বাড়ির সকলে পাশে থেকেছে। বলেছে সময় লাগুক, চেষ্টা কর, হয়ে যাবে।" "নিজের কী খামতি ছিল যে, এতটা সময় লাগল?" রূপা বাংলা মাধ্যমে পড়েছে। ইংরেজি মাধ্যমের এনসিইআরটির বইগুলোর সঙ্গে ধাতস্থ হতে সময় চলে গেছে কিছুটা। ২০২০ সালে আবার লকডাউন শুরু

হল। মাঝপথে হস্টেল থেকে বাড়ি চলে আসতে হল। অনলাইনে নতুন ধরনের পড়াশোনা, তাও আবার বাড়ির পরিবেশ। এইসব কারণগুলো অনেকের প্রস্তুতিকেই প্রভাবিত করেছে। রূপা ভেবেছিল এ-বার এম.বি.বি.এস. পড়ার মতো র‍্যাঙ্ক হবে। তবে এত ভালো র‍্যাঙ্ক হবে ভাবেনি।

রূপার আব্বা নেসমত আলি সেখ ফাইভ-সিক্স পর্যন্ত পড়েছেন। চাষবাস করেন। মা চায়না বিবির পড়াশোনা ক্লাস ফোর পর্যন্ত। রূপারা পাঁচ ভাই দু-বোন। রূপা সবার ছোটো। রূপার এক দাদা এম.এসসি. পাস করেছেন। টিউশনি পড়ান। আল-আমীন মিশন নিম্নবিত্ত পরিবারের রূপার পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে বরাবর পাশে থেকেছে। মাত্র এক তৃতীয়াংশ বেতনে পড়েছে সে। নিম্নবিত্ত ছা-পোষা পরিবারের দুই সন্তান আজ ডাক্তার হতে চলেছে। পুরো পরিবার উজ্জ্বল আলোকময় সকালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

ইনামুল হাসান খান

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৭২৩৩, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ২৪৭

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

"আমি এমন একটা পরিবার থেকে এসেছি, যেখানে দেখে অনুকরণ করেও যে শিখব, তেমন মানুষ চারপাশে নেই। মিশনে ভালো শিক্ষক আছেন অনেক, তাঁদের কারো কারো সাহচর্যে জীবনটাই বদলে যেতে পারে। মহম্মদপুর শাখায় বাংলা পড়াতেন রুজভেল্ট স্যার, তিনিই আমাকে প্রথম চিহ্নিত করেন। মিশনের স্যাররাই শুধু নন, সিনিয়র দাদা-দিদিরাও এমন থাকেন, যাঁদের আইডল মানা যায়। শুধু পড়াশোনায় ভালো এমন নয়, আচার-ব্যবহারও খুব

ভালো। আমি নিজে দাদাদের অনুসরণ করতাম খুব। কতক্ষণ পড়েন, কীভাবে পড়েন— সেসব তো ছিলই, এমনকী কথাবার্তা, হাঁটাচলা পর্যন্ত কপি করার চেষ্টা করেছি। একে অপরকে দেখে পড়ার ইচ্ছে তৈরি হয়, গড়ে ওঠে প্রতিযোগিতার মনোভাব। যেটা অনেক ছেলে-মেয়েকেই ভালো ফল করতে সাহায্য করে।"

কথাগুলো বলছিল ২০২১ সালের নিট পরীক্ষায় ৭২৩৩ র‍্যাঙ্ক করা ইনামুল হাসান খান। মিশনের দাদাদের ভালো রেজাল্ট দেখে ভালো পড়াশোনা করতে চাওয়া ইনামুল পড়াশোনায় কেমন? ক্লাস ফাইভ থেকে আল-আমীন মিশনের মহম্মদপুর শাখায় পড়াশোনা করা ইনামুলের রেজাল্টের ওপর নজর দিলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৭ সালে মহম্মদপুর শাখা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৯১.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল। ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক। নয়াবাজ শাখা থেকে। পেয়েছিল ৯৩ শতাংশ নম্বর। ইনামুলের আব্বা শাহজামাল খান কথা বলার সময় জানালেন, তাঁর ছেলে খুবই মেধাবী। বরাবর পরীক্ষায় তার প্রমাণ রেখেছে ইনামুল।

ইনামুলের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর থানার জোয়াল মাঠপাড়া গ্রামে। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস শাহজামাল সাহেব একটা মুদিখানা চালান। ইনামুলের মা গুলফুননেসা বিবির পড়াশোনা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। তিনি গৃহবধূ। ইনামুলরা তিন ভাই দু-বোন। ইনামুল সবার বড়ো। বাকি চার জনও পড়াশোনা করছে। মেজোছেলে ও বড়োমেয়েকেও দুটি আবাসিক মিশনে রেখে পড়াশোনা করিয়েছেন

শাহজামাল সাহেব। তাঁরা কলেজে পড়ছেন এখন। আর্থিক কারণে ছোটোছেলে ও ছোটোমেয়েকে কোনো আবাসিক প্রতিষ্ঠানে রেখে পড়াতে পারেননি। তিনি যে-মুদিখানা চালান, তার ওপর নির্ভরশীল দুটো পরিবার। ইনামুলের মামাও দোকানে থাকেন। ফলে দুটো পরিবারের খরচ চলে দোকান থেকেই। আগের চেয়ে দোকানের ব্যাবসা খারাপ হয়েছে, তাই সবকিছু সামাল দিতে অসুবিধা হচ্ছে। এসব কথা শাহজামাল সাহেব অবশ্য বলেননি, বলল ইনামুল। ইনামুলকে অবশ্য আল-আমীন মিশন বরাবর, সেই ক্লাস ফাইভ থেকে নিটের দু-বছর কোচিং নেওয়া পর্যন্ত, বিশেষ আর্থিক ছাড়ে পড়াশোনা করার সুযোগ দিয়েছে।

পড়াশোনায় বরাবর ভালো হলেও এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেতে ইনামুলকে বেগ পেতে হয়েছে, প্রথম বারেই সুযোগ পায়নি। ২০২০ সালে পরীক্ষা দিয়ে র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫৫ হাজারের কাছাকাছি। হোমিয়োপ্যাথি পড়ার সুযোগ পেলেও ভর্তি হয়নি। পড়াশোনায় ভালো হলেও রানিং ইয়ারে তো হয়ইনি, এমনকী, এক বছর কোচিং নেওয়ার পর, পরের বছরও হল না। একটা মানসিক ধাক্কা— সেটা কাটিয়ে কীভাবে সফল হল? ইনামুলের কথায়— "দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। সামনে কোনো রাস্তা ছিল না। তাই প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছি। শেষ পাঁচ মাস বাড়িতে ছিলাম যখন, সপ্তাহে এক দিন জুম্মা পড়ার জন্য বাইরে বের হতাম। বাড়ি আর ছাদ ছিল আমার ভুবন। প্রতিদিন একটা করে পরীক্ষা দিতাম।" এটা ইনামুল করতে পেরেছে ভেতরের তাগিদ থেকেই। কারণ, তার সামনে অন্য কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। পরিবারের সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ভাই-বোনদের পড়াশোনা, তাদের একটা ভালো সম্মানের জীবন দেওয়া— সবকিছু নির্ভর করছে পরিবারের সেরা মেধাবী ছেলেটার ওপর। তাই ইনামুলের র‍্যাঙ্ক করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছে ইনামুল। সেই চেষ্টার ফল ৭২৩৩ র‍্যাঙ্ক।

আসিফ ইজাজ সরকার

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৮৪৪৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩১৭

ইনসটিটিউট অফ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ

প্রত্যেক বছর আল-আমীনের সমস্ত রকমের পরীক্ষার ফল বেরোলে জেলা হিসেবে সর্বোচ্চ স্থান পাকা তথাকথিত পিছিয়ে পড়া মুর্শিদাবাদের। এই জেলার হরিহরপাড়া থানার স্বরূপনগর গ্রামের আমিরুদ্দিন সরকার আক্ষরিক অর্থেই দিনমজুর। তাঁর স্ত্রী মেহেন্নেগার বিবি স্বামীর এই সামান্য আয়েই এক বেলা নিরন্ন থেকেও সন্তানদের শিক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর। এই বাড়ির সন্তান আসিফ। সাধারণত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক পরিবারের ছেলেরা একটু ডাগর হলেই তাদের কাজে লাগিয়ে দেওয়াই বিধিলিপি। আমিরুদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী কিন্তু এ-ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যতিক্রমী। এভাবেই গ্রামের স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে আসিফ।

মিশনের বহু প্রাক্তনী, যাঁরা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অফিসার হয়েছেন, তাঁরা এই জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন। তাঁদের সাফল্যের রূপকথায় আসিফের আব্বা-মাও ছেলেকে আল-আমীনে ভর্তি করতে উৎসাহিত হয়ে উঠেন। আসিফ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাসও

করে, কিন্তু ভর্তির জন্য অর্থের জোগান কীভাবে হবে, সে-ভাবনায় তাঁরা বেশ চিন্তায় পড়ে যান। আসিফের রেজাল্ট ও তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা দেখে মিশন কর্তৃপক্ষ মাসিক ২৯০ টাকা ফিতে উজুনিয়া শাখায় ভর্তি করে নেন। ২০১৮ সালে আসিফ ৯০.৮৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক এবং ২০২০ সালে ৯৪.৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মিশনের মেমারি শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। রানিং বর্ষে আশানুরূপ ফল না হওয়ায় মিশনের পাইকপাড়ি শাখায় এক বছর নিটের কোচিং নেয় আসিফ। তার আব্বা-মায়ের প্রাণ ভরিয়ে দেওয়ার মতো খবর হল, আসিফ এ-বছর নিটে সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক করে ৮৪৪৮। উল্লেখ্য, উচ্চ-মাধ্যমিক ও নিটের কোচিঙেও আসিফের মাসিক ফি ছিল নামমাত্র। আসিফ বর্তমানে কলকাতার পি জি-তে এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হয়েছে। সম্প্রতি আসিফ ও তার আব্বা মিশনের সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। আসিফের জন্য আবেদন করেন আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপের। কারণ, বইপত্র কেনা ও আনুষঙ্গিক খরচের কয়েক হাজার টাকাও তারা বহনে অক্ষম। সেক্রেটারি স্যার সহাস্যে আসিফের আব্বাকে বলেন, "আপনি প্রথম অভিভাবক হলেও আমিও তার অভিভাবক।" আসিফকে ডেকে বলেন, "ভালো করে মন দিয়ে পড়াশোনা কর, বড়ো ডাক্তার হতে হবে।" সঙ্গে উপহার ছিল মাসিক ৩০০০ টাকার স্কলারশিপের অনুমোদন।

ফারহিন সুলতানা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৯৩২৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৩৭৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার চাপাডাঙা এলাকার গঙ্গারামবাটি গ্রামে বাড়ি ফারহিন সুলতানার। ২০২১ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ৯৩২৮। ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬২৬। এই সোনালি সাফল্যকে স্পর্শ করতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে ফারহিনকে। ফারহিন আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয়েছিল ক্লাস এইটে। পড়ত বীরভূমের পাথরচাপুড়ি শাখায়। ওই শাখা থেকে পড়াশোনা করে ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৬২১ নম্বর। ৮৮ শতাংশ। তারপর চলে আসে খলতপুর শাখায়। ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৬.৪ শতাংশ নম্বর। এরপর খলতপুর শাখাতেই নিট পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করে। ২০১৯ সালের নিট পরীক্ষায় ফারহিনের র‍্যাঙ্ক হয় এক লাখ চোদ্দো হাজারের মতো। সুতরাং আরও এক বছর চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। ২০২০ সালে র‍্যাঙ্ক হল ৪৫ হাজারের কাছাকাছি। বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল। ভর্তি হয়ে গেল ফারহিন। কিন্তু বি.ডি.এস. পড়তে মন চাইছিল না। মনে হল এত কাছাকাছি যখন র‍্যাঙ্ক চলে এসেছে, আর-একটু চেষ্টা করলে হয়ে যাবে। সেই ভাবনা থেকেই আবার চেষ্টা শুরু করে দিল ফারহিন। মিশনে তিন-চার মাস থাকার পর আবার লকডাউন শুরু হয়, তাই বাড়িতে থেকেই বাকি পড়াশোনা চালাতে হয়। মিশনের অনলাইন পাঠ আর নিজে নিজে পড়া— দুইই চলতে থাকে। একের পর এক মিশনের মকটেস্টগুলি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে দিতে থাকে। লেগে থাকার ফল স্বরূপ তার চমকপ্রদ নিট র‍্যাঙ্ক— এম.বি.বি.এস. পড়ার ছাড়পত্র পেয়ে যাওয়া।

ফারহিন নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তার পিতা হাফিজ রহমান বি.এ. পাস হলেও চাকরি পাননি। পারিবারিক জমিজমাও তেমন নেই। হাফিজ সাহেব রুটি-বিস্কুটের বেকারিতে হিসাবরক্ষকের কাজ করেন। ফারহিনের মা মঞ্জুরা বেগম মাধ্যমিক পাস, গৃহবধূ। বাড়িতে এক ভাই আছে, সে দশম শ্রেণিতে পড়ছে। ফারহিন মাত্র ৫৯০ টাকা বেতন দিয়ে মিশনে পড়াশোনার যাত্রা শুরু করেছিল। নিট-কোচিং পর্যন্ত সে এক তৃতীয়াংশেরও কম বেতনে পড়েছে মিশনে। শুধু এই সাত-আট বছর পাশে থাকা নয়, বি.ডি.এস. থেকে এম.বি.বি.এস. অভিমুখে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পাশে পেয়েছে মিশনকে। অনেকেই জানেন, বি.ডি.এস. পাঠরত অনেক ছাত্র-ছাত্রী এক-দু বছর পড়ার পর সুযোগ পেয়ে এম.বি.বি.এস. পড়তে চলে যায়। ফারহিন যেমন জানাল, তার সঙ্গে আরও পাঁচ জন বি.ডি.এস. পড়ুয়া এ-বছর খলতপুর শাখা থেকে নিট প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। তারা সবাই এ-বার এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে। ভর্তি হওয়ার পর বি.ডি.এস. পড়া সম্পূর্ণ না করলে ফাইন দিতে হয় প্রায় এক লাখ দশ হাজার টাকা। ফারহিন ফাইনের এত টাকা দিতে অপারগ হওয়ায় মিশনের শরণাপন্ন হয়। মিশন ফারহিনের স্বপ্ন পূরণে এই ক্ষেত্রেও পাশে দাঁড়িয়েছে। ফারহিন নিজেই জানাল এ-কথা। আল-আমীন মিশন সেই প্রথম থেকে পাশে না থাকলে ফারহিনের মতো নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়, মনে করে ফারহিন।

সালেমা খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১০৮৬২, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৪৮৬

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

বি.ডি.এস.-এ ভর্তি হয়ে ছেড়ে দিলে লাখ টাকার ওপর গচ্চা দিতে হবে বলে সুযোগ পেয়েও ভর্তি হয়নি সালেমা খাতুন। পরিবর্তে সে বি.এ.এম.এস.-এ ভর্তি হয়েছিল এটা ভেবে যে, এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ না পেলে আয়ুর্বেদ ডাক্তার হবে। মাঝপথে ছেড়ে গেলে এখানে ফাইন দেওয়ার ঝক্কি নেই। অনেক অঙ্ক কষে এগিয়েছে সালেমা। শেষপর্যন্ত হুগলি জেলার আরামবাগ শহরের দৌলতপুর এলাকার গ্যারেজ-মিস্ত্রি সৈয়দ বসির আহমেদের মেয়ে সালেমা খাতুনের এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়েছে। ২০২১ সালের নিটে ৬২১ নম্বর পেয়ে র‍্যাঙ্ক করেছে ১০৮৬২। গতবছর সালেমার র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৫০৪৫৩।

আরামবাগ এলাকার ভালো স্কুল হিসেবে পরিচিত আরামবাগ গার্লস স্কুল। ওই স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার পর নিট-কোচিং নিতে আল-আমীন মিশনে আসে সালেমা। ২০১৬ সালে মাধ্যমিকে ৮৮.১৪ শতাংশ ও ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে ৮৭.৪৪ শতাংশ নম্বর পায়। খলতপুর শাখায় কোচিং নিয়ে ২০১৯ সালে নিট পরীক্ষায় র‍্যাঙ্ক হয় ১ লক্ষ ২০ হাজারের মতো। এরপর সালেমা মিশনের বারুইপুর শাখায় চলে যায়। আল-আমীন মিশনে ভর্তি হতে আসা প্রায় প্রত্যেকেই খলতপুর শাখাতে ভর্তি হতে ইচ্ছে প্রকাশ করে। কিন্তু সালেমার ক্ষেত্রে হয়েছিল উলটো। সে নিজে বারুইপুর শাখা পছন্দ করে, যেখানে ভিড় কম।

২০২১ সালে মিশনে কয়েক মাস থাকার পরে বেশিরভাগ সময়টাই বাড়িতে পড়তে হল লকডাউনের কারণে। অনলাইন পড়াশোনার সঙ্গে

ছাত্র-ছাত্রীদের মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লেগেছে। গতবছর বি.ডি.এস. পড়ার সুযোগ পাওয়ায় বাড়ির সকলে বলেছিলেন ভর্তি হয়ে যেতে। কিন্তু মন মানেনি সালেমার। আল-আমীন মিশন পাশে থেকেছে। এক বছর কোচিং নিতে গেলে অনেক টাকা লাগবে, এই ভেবে মিশনে এসেছিল। মিশন প্রত্যাশিত সহায়তা নিয়ে পাশে থেকেছে। প্রায় এক তৃতীয়াংশ বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। সালেমার বোন রেশমাও নিট-কোচিং নিচ্ছে আল-আমীন মিশনে। একমাত্র ভাই আরামবাগ বয়েজ স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ছে। সালেমাদের প্রকৃত বাড়ি বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে। গাড়ি মেরামতির কাজ শিখে ভাগ্যান্বেষণে আরামবাগে থিতু হয়েছেন সালেমার বাবা। ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা শিখে মানুষ হবে, বড়ো হবে ভেবেছিলেন। কোনোদিন ভাবেননি ডাক্তার হওয়ার মতো গৌরবের জায়াগায় পৌঁছোবে। আল-আমীন মিশনের ছত্রছায়ায় এসে সেই না-ভাবা স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ায় গোটা পরিবার খুশি।

সেখ রাজীব

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৪১৭৮, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৬৯৭

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

নিট পরীক্ষার সফল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে লেখার জন্য একটা তালিকা দেওয়া হয়। সেই তালিকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকানা, ফোন নম্বর, র‍্যাঙ্ক, বেতন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। লেখা হবে বড়োজোর চল্লিশ জনকে নিয়ে। কিন্তু যে-তালিকা দেওয়া হয়, সেখানে ২৩৩ জনের নাম আছে। কাদের নিয়ে লেখা হবে, তা লেখকের নিজস্ব পছন্দের বিষয়। বেতনের ক্রম অনুসারে পর পর নাম লেখা আছে ছাত্র-ছাত্রীদের। সবচেয়ে কম বেতন ৬৯০ টাকা। প্রদানকারী ছাত্রের নাম সেখ রাজীব। পিতার নাম হিসেবে নথিবদ্ধ আছে মৃত

সেখ নাজির হোসেন। এতিম মেধাবী পড়ুয়াদের আল-আমীন মিশন যে বাড়তি সুযোগ দেয়, তা অনেকে জানেন। রাজীবও তেমন কোনো ছাত্র। কথা বলার জন্য প্রদত্ত ফোন নম্বরে ফোন করতেই ট্রু-কলারে নাম ভেসে ওঠে মহম্মদ সাব্বির সরকার, সঙ্গে ছবিও। স্পষ্ট হয়, আল-আমীন মিশনের পাঁচুড় শাখার সুপারিনটেনডেন্ট ইনি। খানিক খটকা-লাগা স্বরে জিজ্ঞাসা করা হয় সেখ রাজীব সম্পর্কে কথা বলতে চাই। “বলুন”— ওদিক থেকে উত্তর আসে। “আপনি ...” । কথা শেষ না হতেই বলেন, “আমিই তো ওর গার্জেন।” কথা শুরু হতে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে নতুন এক গল্প। রাজীবের যখন মাত্র ছ-মাস বয়স তখন তার পিতা ব্লাড ক্যান্সারে মারা যান। রাজীবকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন সাব্বির সাহেব। রাজীব যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে, তার মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। রাজীবের খালা-খালু, অর্থাৎ সাব্বির ও তাঁর স্ত্রী রাজীবকে সেই ছোটো বয়স থেকে কোলেপিঠে নিজেদের সন্তানের মতোই আদর-যত্ন করে বড়ো করেছেন। সাব্বির সাহেব জানালেন, ল্যাকটোজেন বেবিফুড কিনে খাইয়েছেন, সেই অবস্থা থেকে বড়ো করেছেন। শুধু বড়ো করেননি, উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়ার সব আয়োজন হাজির করে মানুষের মতো মানুষ করেছেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর চেষ্টাতেই রাজীব ২০২১ সালের নিটে ১৪১৭৮ র‍্যাঙ্ক করেছে।

রাজীব আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস ফাইভ থেকে। উনশানি

শাখায় ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। ক্লাস টেনটা পড়েছে বাগনান শাখায়। আর ইলেভেন-টুয়েলভ পড়েছে পাঁচুড় শাখায়, সাব্বির সাহেবের নিজের পথপ্রদর্শন ও তত্ত্বাবধানে। ২০১৯ সালে রাজীব মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৯১ শতাংশ নম্বর। ২০২১ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পেয়েছে ৯৩.৪ শতাংশ নম্বর। আল-আমীন মিশনের নিট পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় দেখা গেল, সেখ রাজীবের নাম আছে ১০০-তম স্থানে। ৭২০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ৬১২ নম্বর। কিন্তু এই ফলের মাঝে লুকিয়ে আছে আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সেটি হল, রানিং ইয়ারেই র‍্যাঙ্ক করা। কীভাবে পড়াশোনা করেছে, এই প্রশ্নে রাজীব জানায়, “২০১৯ সালের ৮ এপ্রিল ইলেভেনে ভর্তি হই। জুন থেকে নিট-কে ফোকাস করে পড়াশোনা শুরু করি।” রানিং ইয়ারে র‍্যাঙ্ক করতে চাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু পরামর্শ দিয়েছে রাজীব। তার মতে, “ইলেভেন-টুয়েলভের ক্লাসটা ভালো করে করতে হবে। শিক্ষকদের নির্দেশ মেনে, তাঁরা যেমন বলবেন তেমনভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। আর নিট পরীক্ষায় বসার আগের তিন মাস প্রতিদিন একটা করে মকটেস্ট দিতে হবে। অন্তত ১০০-টা মকটেস্ট দেওয়ার টার্গেট নিতে হবে।” যদিও রাজীব জানায়, সে ১০০-টার টার্গেট পূরণ করতে পারেনি, ৮৪-টা মকটেস্ট দিতে পেরেছিল। অ্যাকাডেমিক পড়াশোনার বাইরে কী করতে ভালো লাগে, এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে—

গল্প-উপন্যাস পড়তে। রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’, শরৎচন্দ্রের কিছু বই, কিছু অ্যাডভেঞ্চারের বই সে পড়েছে। মিশনের বাঁধাধরা রুটিনে বাড়তি বই পড়ার সুযোগ কম, তাই কীভাবে কবে পড়ল, জিজ্ঞাসা করায় জানাল সে, এসবই পড়েছে নিট পরীক্ষা দেওয়ার পর। ভবিষ্যতে কীভাবে এগোতে চায়, সে-বিষয়ে রাজীব জানায়, “আগে জানি, তারপর ভাবব কী করব।”

সেখ জুয়েল

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ১৫০৪৪, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ৭৬৩

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

প্রথম বার নিট পরীক্ষা দিয়ে কোনো ছাত্র-ছাত্রীর যদি র‍্যাঙ্ক হয় ২৫০৬২৭, তাহলে অনেকেই বিশেষজ্ঞের মতো ভ্রূ কুঁচকে বলবেন, একে দিয়ে হবে না। কেউ কেউ একটু বেশি আশাবাদী হলে মনে করতে পারেন, তিন-চার বারের চেষ্টায় হলেও হতে পারে। আমরা অনেকেই জানি সরকারি কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার নিশ্চিত সুযোগ পেতে গেলে ৩৫০০০-এর মধ্যে র‍্যাঙ্ক হলে ভালো হয়। তাই আড়াই লাখ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজারে পৌঁছে যাওয়াটা অনেকটা লাস্ট বয় থেকে ফার্স্ট বয় হয়ে যাওয়ার মতোই।

এরকমই ঘটনা ঘটিয়েছে মালদা জেলার মানিকচক থানার ডাল্লুটোলা এলাকার ছেলে সেখ জুয়েল। জুয়েলের পরিবারের দিকে তাকালে আরও অবাক হতে হবে, মনে হবে সে সত্যিকার জুয়েল—রত্ন। তার পিতা মোস্তাক আলি পড়াশোনা জানেন না। কলকাতার একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির লরিতে মালপত্র ওঠানো নামানোর কাজ করতেন। বয়স হয়েছে, তাই এখন বাড়িতেই থাকেন। মা রাহেলা বিবিও পড়াশোনা জানেন না। বোন নেই, একমাত্র দাদা আনারুল সেখ মাধ্যমিক পাস। তিনিও শ্রমজীবী মানুষ। কোম্পানির দেওয়া পোলট্রির মুরগির বাচ্চা, খাবার বা অন্যান্য সব উপকরণ নিয়ে মুরগির চাষ করেন,

বিনিময়ে মজুরি পান। তিনি বিবাহিত, স্ত্রী-সন্তান আছে।

তিনি ছোটোভাই ও মা-বাবাকে নিয়ে যৌথভাবে থাকেন। কথা প্রসঙ্গে জুয়েল জানাল, কোভিড পরিস্থিতির কারণে নিট-কোচিঙের বেশিরভাগটাই অনলাইনে বাড়িতে থেকে করতে হয়েছে। অ্যাসবেসটসের ছাউনির বাড়িতে গরমে পড়তে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যখন ইলেকট্রিক থাকত না তখন আরও অসুবিধা হত। এতরকম প্রতিকূলতার পাহাড় টপকে জুয়েল নিট পরীক্ষায় ১৫০৪৪ র‍্যাঙ্ক করেছে। জুয়েল আল-আমীন মিশনে এসেছিল মাধ্যমিক পাস করার পর। ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছিল ৬৩১ নম্বর, শতাংশের হিসেবে ৯০ শতাংশের বেশি। আল-আমীন মিশনের নয়াবাজ শাখায় দু-বছর পড়ার পর ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৮৭.৬ শতাংশ নম্বর।

খলিশানি শাখায় নিট-কোচিঙের জন্য ভর্তি হয়ে কয়েক মাস ক্লাস করার পর লকডাউনের কারণে বাড়ি চলে যেতে হয়েছিল। বাড়ি থেকে অনলাইন কোচিং আর সেল্ফ-স্টাডি করে ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র হাসিল করেছে জুয়েল। জুয়েলকে জীবনসংগ্রামে সহায়তা করতে আল-আমীন মিশন— প্রায় এক চতুর্থাংশ বেতনে পড়ার সুযোগ দিয়েছে।

নাজমি খাতুন

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২০১৬৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১০৮৪

নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

কলকাতার অনতি দূরে মহেশতলা থানার সন্তোষপুর। ২০১৭-'১৮ সাল। মাত্র চার বছর আগে কলকাতা লাগোয়া স্থানের কোনো পরিবার আল-আমীন মিশনের নাম শোনেনি, হতে পারে?

স্থানীয় বিদ্যালয়ে ফার্স্ট গার্ল হলেও, মাধ্যমিকে ৮৭ শতাংশ নম্বর পেলেও, নাম নাও শুনতে পারে, যদি সচেতনতার আলো না পৌঁছোয়। যদি নিজেদের ছোট্ট জগতের মধ্যেই কেউ কেবল বেঁচে থাকার রসদ জোগাড়ে রত থাকেন, তাহলে না শোনাই স্বাভাবিক। যে-পরিবারের কর্তা সামান্য পড়াশোনা জানেন, জীবন-ধারণের জন্য ইলেকট্রিকের কাজ করেন, যাঁর প্রায় পড়াশোনা না-জানা স্ত্রী সেলাইয়ের কাজ করে সামান্য সহায়তা দিতে দিনক্ষয় করেন, তাঁদের সামনে বাইরের জগতের খোঁজ রাখার সুযোগ কোথায়!

তবু আল-আমীন মিশনের কথা পৌঁছেছিল। আর পৌঁছেছিল বলেই, ওই পরিবারের মেয়ে ডাক্তার হওয়ার প্রায় অলৌকিক এক স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছে। নাজমি খাতুনকে আল-আমীন মিশনের কথা শুনিয়েছিলেন তার প্রাইভেট টিউটর। নদিয়া থেকে কলকাতায় পড়তে এসে মেসে থাকতেন সাবেদ নামে একজন। তাঁর কাছে প্রাইভেট পড়ত নাজমি। নাজমির মেধা দেখে তাকে আল-আমীন মিশনে ভর্তির পরামর্শ দিয়ে শুধু দায়িত্ব সারেননি, নাজমির পিতাকে ও নাজমিকে খলতপুর নিয়ে গিয়ে ভর্তির বিষয়ে সহায়তা করেছেন। নাজমি আল-আমীন মিশনের মেমারি শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল ২০১৮ সালে। ২০২০ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পায় ৯৫.২ শতাংশ নম্বর। রানিং ইয়ারে নিট পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিল ৩৩০ নম্বরের

মতো। তারপর ২০২১ সালে নিট-কোচিং নেয় আল-আমীন মিশনের বারুইপুর শাখায়। মাস কয়েক আবাসিক কোচিং নেওয়ার পর লকডাউন চালু হয়ে যায়। বাড়িতে থেকেই বাকি প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। নাজমিদের দুটো মাত্র ঘর। একটা ঘর নাজমিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু ঘর ছেড়ে দেওয়াই নয়, যাতে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে তার জন্য সহযোগিতা করেছেন বাড়ির সকলে। এমনকী, খাবারটুকু বেড়ে তার সামনে রেখে দরজা বন্ধ করে নীরবে ফিরে যেতেন মা কুলসুম বিবি। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই নাজমি আজ ডাক্তার হতে চলেছে। নিট পরীক্ষায় ৫৯৭ নম্বর পেয়ে তার র‍্যাঙ্ক হয়েছে ২০১৬৫।

নিটের প্রস্তুতি নিতে নাজমি শেষের দিকে কয়েক মাস খুব মন দিয়ে দৈনিক বারো-চোদ্দো ঘণ্টা পড়েছে। মিশনের অনলাইন ক্লাস ও মিশনের মকটেস্টের পাশাপাশি নিট পরীক্ষার আয়োজক সংস্থা এনটিএ-র যে-অ্যাপ আছে, তাতেও নিয়মিত মকটেস্ট দিয়েছে। ভালো রেজাল্ট করে চাকরি অথবা ভালো কিছু করা— এমন দোদুল্যমান লক্ষ্যে মিশনে এসে ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। সেই ছাড়পত্র ইলেকট্রিকের কাজ করা পিতা বা সেলাইয়ের কাজ করা মায়ের মুখে শুধু হাসি ফোটায়নি, পরিবারের সকলের সামনে নতুন সকালের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

আল-আমীন মিশন এমন একটা পরিবারকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে তুলে আনার পেছনে অনুঘটকের কাজ করেছে। এক চতুর্থাংশ বেতনে নাজমি পড়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করেছে। মিশন যে তার ওপর ভরসা রেখেছে, তার মূল্য দিতে সমর্থ হয়েছে। পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি আল-আমীন মিশন পরিবারের একজন গর্বিত সদস্য হয়ে উঠেছে নাজমি খাতুন।

আতাউল শা

সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২২৮০৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১২৫৫

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

আতাউল শার কথা ছোট্ট পরিসরে অল্প কথায় লেখার মতো নয়। তার জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে গল্প। শুরুর গল্পটাই চমকপ্রদ।

আতাউল শা ও তার দাদাকে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে হাত ধরে আল-আমীন মিশনের খলতপুর শাখায় প্রথম নিয়ে গিয়েছিলেন বেলা রায়। মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। প্রায় ৩০ কিলোমিটার রাস্তা উজিয়ে দুই প্রাক্তন ছাত্রকে নিয়ে মিশনে এসে শুনলেন, সেক্রেটারি স্যার কিছুক্ষণ আগে কলকাতা বেরিয়ে গেছেন। ভর্তির পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর হাজির হয়েছিল আতাউলরা। আবার আলাদা করে একটা পরীক্ষা দিয়ে আল-আমীন মিশনের মেদিনীপুর শাখায় ভর্তি হয় আতাউল। আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রায় সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পায়। তখন আতাউলের মাসিক ফি ছিল ৫৯০ টাকা। আতাউলের পিতা মজনু আলি শার পড়াশোনা ক্লাস ফোর পর্যন্ত। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কাপড় ফেরি করেন। মা রুনা বিবি নাম সইও করতে পারেন না। সাধারণ গৃহবধূ, সঙ্গে ছাগল-মুরগি-হাঁস পালন করে সংসারে সহায়তা করেন। ভিটেটুকু ছাড়া চাষের কোনো জমি

নেই। বরাবর ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে এগোতে হয়েছে আতাউলকে। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কুড়ি-পঁচিশ দিন আগে শিরদাঁড়ার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। বাড়ি ফিরেও দশ-বারো দিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হয়। ওই অবস্থায় ২০১৮ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে ৭৬.৪ শতাংশ নম্বর পেয়েছিল সে। আতাউল নিটের কোচিং নিয়েছে খলতপুর ক্যাম্পাসে।

২০১৯ সালে নিট পরীক্ষা দিতে গিয়ে সেন্টারে ঢোকার মুখে আধার কার্ডের সঙ্গো, অ্যাডমিট কার্ডে উল্লিখিত পিতার নামের বানানে সামান্য হেরফের থাকার জন্য ঢুকতে দেয়নি। অন্য ডকুমেন্টস আনতে বলে। সেই ডকুমেন্টস নিয়ে অবশেষে পরীক্ষা দিতে পারে আতাউল। কিন্তু দেরি হওয়ার কারণে সব এলোমেলো হয়ে যায়। র‍্যাঙ্ক আসে ১ লাখ ২২ হাজারের মতো। ২০২০ সালের পরীক্ষাতেও র‍্যাঙ্ক ভালো হয় না। অথচ ক্লাসের সব পরীক্ষায় ভালো ফল হত। ২০২০ সালে আতাউলের নিট র‍্যাঙ্ক হয়েছিল ৭৬৪৭৪। বাড়ি থেকে অনবরত চাপ দেয় ডাক্তারি পড়ার আশা ছেড়ে অন্য কিছু পড়ার। দাদা ডি.এম.এল.টি. পড়ে, বোন স্কুলে পড়ে, তাদের খরচ জোগাতে হচ্ছিল, তাই অপেক্ষা করা যাবে না বলে জানায়। গরিব মানুষের অত বড়ো স্বপ্ন পূরণ হবে না, ধরে নেন আব্বা-মা। জেনপাস, এগ্রিকালচার, প্যারামেডিকেল কোর্সে ভর্তির সুযোগ পায়, কিন্তু যেতে মন চায় না তার। আর এক বছর চেষ্টা করতে চায় আতাউল। ওদিকে লকডাউন পড়ে গেছে। বাড়িতে থেকে পড়তে হবে, কিন্তু বাড়িতে সেই পরিবেশ নেই। বাড়ির পাশেই মদের ভাঁটি, নিত্য চেঁচামেচি। পাশে নিম্নবর্গীয় মানুষরা উচ্চস্বরে বক্স বাজিয়ে গানবাজনা নিয়ে মেতে ওঠে এক-দু দিন ছাড়া ছাড়া। আতাউল মিশনে ফিরে আসে। মিশনের সুপারভাইজার মারুফ আজম (গোরাই স্যার)-কে সমস্যার কথা বলে। গোরাই স্যার বিবেচনা করে বলেন, লকডাউনে সব বন্ধ, একটা রুমে একা থাকতে হবে। আর কেউ জিজ্ঞাসা করলে যেন বলে রাজমিস্ত্রির কাজ করে মিশনে। বাড়ি ফিরতে না-পারায় আটকে গেছে। সেই ‘রাজমিস্ত্রি’ আতাউল অবশেষে সফল হয়। এত লড়াই, বছরের পর বছর মিশনকে পাশে পাওয়া আর বেলা রায়ের মতো মানবপ্রেমী মানুষের ভরসার প্রতি মর্যাদা রক্ষা করতে পারে আতাউল। ২০২১ সালে তার নিট র‍্যাঙ্ক হয় ২২৮০৫। ফেরিওয়ালার ছেলে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার হওয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। আল-আমীন মিশনে যে এমন কত আতাউল লুকিয়ে আছে, তাদের সকলের কথা বলা হয় না, জানা যায় না তাদের সবার জীবনসংগ্রামের কথা। আল-আমীনের লালন পেয়ে এমন কত আতাউল জীবন খুঁজে পেল, দেশ ও সমাজের সম্পদ হয়ে উঠল, তার সঠিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা সত্যিই কঠিন।

মোফাস্সের মোল্লা

সর্বভারতীয় মেডিকেল র‍্যাঙ্ক ৩০৪৬৫, রাজ্য র‍্যাঙ্ক ১৭৭৮

রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

আল-আমীনের অসংখ্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সাফল্যগাথায় আমরা সাধারণত দুটো দিকের প্রতি ততটা লক্ষ ও গুরুত্ব দিই না— কোন সামাজিক অবস্থান থেকে পড়ুয়ারা সাফল্যের শিরোপা অর্জন করছে এবং সাফল্যের এই যাত্রাপথে মিশন পরিবারের সার্বিক একাত্মতা ও দায়বদ্ধতা কী রূপ উভয় বিষয়ের সঙ্গো পরিচিত হতে মোফাস্সের মোল্লার শরণাপন্ন হই।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাঙড়ের এক মেধাবী ছাত্র মোফাস্সের। ছোট থেকেই স্বপ্ন দেখে পড়াশোনা করে বড়ো

কিছু হওয়ার। তার আব্বা হারান মোল্লা আক্ষরিক অর্থেই সর্বহারা। চলমান জীবনের একমাত্র রসদ বিড়ি বেঁধে উনুন জ্বালানো। টালমাটাল এই বাড়িতে নিজ সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে আলাদা করে ভাববার সময় ও রসদ না থাকাই স্বাভাবিক। নিজস্ব পরিশ্রম ও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভালোবাসায় মোফাস্সের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো ফল করে। ততদিনে তার কানে ঢুকে গেছে আল-আমীনের নাম। জেনেও ফেলেছে সেখানে পড়লে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার হওয়া যায়। ছেলের নাছোড় মনোভাবের কাছে বাবা হেরে যায়। নিমরাজি হয়েও মিশনের ভর্তির পরীক্ষায় বসায়। ছেলে পাসও করে। এবারে গন্তব্য খলতপুরে সেক্রেটারি স্যারের অফিস। বিভিন্নজনের কাছ থেকে ভর্তির জন্য অর্থ কত লাগবে— খোঁজ নেন হারান মোল্লা। জবাব শুনে নিজের ম্লান মুখকে আরও গাঢ় ম্লান করে ফেলেন তিনি। দু-একবার ভেবেও বসেন— ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু ছেলে কষ্ট পাবে এই ভেবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে অপেক্ষা করেন। শেষমেশ সেক্রেটারি স্যার তাঁদের আর্থিক দুরবস্থা এবং ছেলেটির মধ্যে পরিশ্রমের অভূতপূর্ব ইচ্ছা দেখে মিশনের মেমারি শাখায় ভর্তি করে নেন তাকে। পিতা-পুত্রের চোখ খুশিতে হয়ে উঠে ছলো-ছলোময়। মাসিক ফি করা হয় তাদের ধারণার চেয়েও কম, প্রায় শূন্য।

এবারে শুরু হয় মোফাস্সেরের সংগ্রাম। ২০১৮-র উচ্চ মাধ্যমিকে প্রায় ৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করার পর সেখানেই নিটের কোচিং নিলেও সফল হতে পারেনি। পরের বছর নিট-এর কোচিং নিতে সে চলে আসে খলতপুর শাখায়। এখানেও প্রথম বছর আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। আবার নতুন উৎসাহ ও উদ্যমে শুরু করে নিট পরীক্ষার প্রস্তুতি। শেষমেশ তার অবিরাম পরিশ্রম ও মিশনের শিক্ষকদের গাইডে ২০২১-এর নিটে তার সর্ব ভারতীয় র‍্যাঙ্ক হয় ৩০৪৬৫। মোফাস্সের মোল্লার নিজস্ব স্বীকারোক্তি হল— তিন বছরের আবাসিক নিট কোচিংও একপ্রকার বিনা ফিতেই সে নিয়েছে। নিটের সাফল্যে বাড়িতে এবং এলাকায় খুশি ছড়িয়ে পড়ে। খুশির মাঝেও সে কিন্তু মনে মনে বেদনা অনুভব করে। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েও সেই বেদনা তাকে ছাড়ে না। কারণ সরকারি মেডিকেল কলেজ হলেও প্রত্যেক মাসের আনুষঙ্গিক খরচ ও বইপত্রের খরচ বহনের ক্ষমতা নেই তার আব্বা হারান মোল্লার। অগত্যা আবার পিতা-পুত্র হাজির হয় মিশনের জেনারেল সেক্রেটারির কাছে। এ-বারেও তিনি মেডিকেলে সফল ওই ছাত্রের জন্য প্রত্যেক মাসে ২৫০০ টাকা স্কলারশিপ অনুমোদন করে পিতা-পুত্রের মুখে হাসি ফোটান।

যারা জাকাত ফান্ড থেকে দেওয়া স্কলারশিপের অর্থে মিশনে থেকে পড়াশোনা করে এখন ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে আল-আমীন মেরিট স্কলারশিপ নিয়ে, আগামী দিনে তারাই আয়কর ও জাকাতদাতায় রূপান্তরিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এইরকমই চার জন ছাত্র, যারা তাদের আব্বা-মায়ের সঙ্গে, এবং রয়েছেন আরও এক অভিভাবক, তাদের জীবনের দ্বিতীয় পরিবার আল-আমীন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম।

রাজ মল্লিক, সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৬৫৩৮।

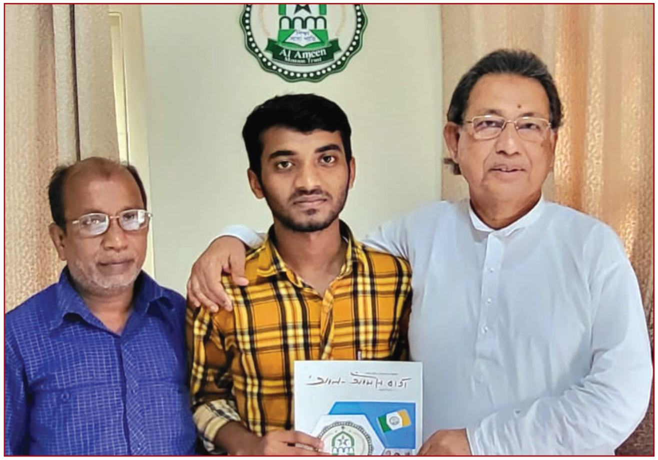

আসিফ ইজাজ সরকার, সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৮৪৪৮।

আতাউল শা, সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ২২৮০৫।

মোফাস্সের মোল্লা, সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্ক ৩০৪৬৫।

জাতির সেবায় ৩৬ বছর

আল-আমীন মিশন

২০২১-এর মেডিকেলে অনন্য নজির

৬০০ নম্বর এবং তার ওপর ১৯১০৫ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **১৪০**	৫৮০ নম্বর এবং তার ওপর ২৮৭১১ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **২৩৫**
৫৬০ নম্বর এবং তার ওপর ৪০২৪৪ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **৩৫০**	৫৫০ নম্বর এবং তার ওপর ৪৬৬৭৫ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **৪০৮**
৫৪০ নম্বর এবং তার ওপর ৫৩৩৬৮ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **৪৬০**	৫৩০ নম্বর এবং তার ওপর ৬০৮২১ র‍্যাঙ্কের মধ্যে **৫১৮**

জেলাভিত্তিক সাফল্য

মুর্শিদাবাদ	১৪১	পূ. ও প. মেদিনীপুর	১৯
মালদা	৯০	হাওড়া	১৩
উ. ও দ. ২৪ পরগনা	৮৫	হুগলী	১২
বীরভূম	৫০	বাঁকুড়া	১১
উ. ও দ. দিনাজপুর	৩১	কুচবিহার	৮
পূ. ও প. বর্ধমান	২৫	অন্যান্য	৮
নদিয়া	২৫	মোট	৫১৮

একটি পিছিয়ে পড়া সমাজকে টেনে তুলছে আল-আমীন মিশন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ অগাস্ট ১৯৯৮

বাঙালি মুসলিমদের শিক্ষায় নবজাগরণের নয়া তীর্থ।

—সংবাদ প্রতিদিন, ১৪ ডিসেম্বর ২০০০

বিদ্যার অভিনব সূর্যোদয়: আধুনিক শিক্ষাখাতে যাকাত ও ফিতরার অর্থ সম্পদের ব্যবহার প্রায় দেখাই যায় না। এদিক থেকে আল-আমীন মিশনের আরম্ভ, নির্মাণ ও বিস্তার অবশ্যই একটি নিঃশব্দ বিপ্লব।

—আজকাল (রবিবাসর), ১৮ নভেম্বর ২০০১

দানের টাকায় আধুনিক শিক্ষা, একটি স্বপ্নের নীরব অভিযান।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

নিম্নবিত্ত পরিবারের ১২৯	নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ১৯২	মধ্যবিত্ত/উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ১৯৭